রামধনু

কিশোর কিশোরীদের
জন্য উপহারের বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ, মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা

প্রকাশক : অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

* * *

মুদ্রাকর : শ্রীযোগেশ চন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, লিঃ
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৫৩ সাল

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

সূর্যের সাত রঙ একসঙ্গে মিশে থাকে ব'লে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। বৃষ্টিকণার কাজ সেই সাত রঙকে পৃথক ক'রে মনোহর রামধনু মূর্তিতে সকলের কাছে প্রকাশ করা। রামধনু দেখে ছেলেদের আনন্দই সব চাইতে বেশি। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বিবিধ রসের সমাবেশ বর্ণহীন সূর্যালোকের মতই বয়স্কদের মনে প্রসন্নতা আনয়ন করে। আমরা বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে তার থেকেই বর্ণাঢ্য 'রামধনু' সংকলন ক'রেই প্রকাশ করছি। কিশোর-কিশোরীদের মুখ চেয়ে কিছু পরিবর্তনের সুযোগও আমরা গ্রহণ করেছি। তারা খুশি হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আমাদের ভূমিকা বৃষ্টিকণার ভূমিকা মাত্র।

বড়দের জন্য এই লেখকের খানকয়েক বই

কালিন্দী ঃ	গণদেবতা
ধাত্রী দেবতা ঃ	মন্বন্তর
জলসাঘর ঃ	তিন শূন্য
যাদুকরী ঃ	দুই পুরুষ
পথের ডাক ঃ	বিংশ শতাব্দী
অভিযান ঃ	সন্দীপন পাঠশালা

সূচিপত্র
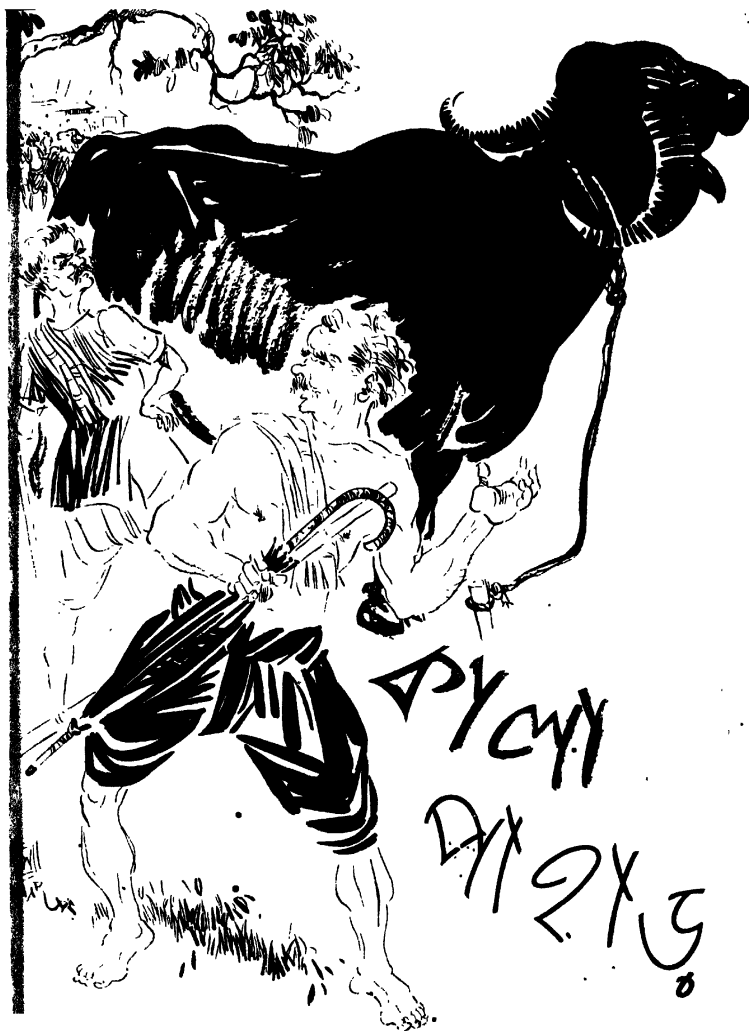
কালাপাহাড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, শান্ত না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মত ভুলিতেও চায় না। যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মন তাই করগে যাও, দুটো হাতী কিনে আনগে। কল্পিত হাতী দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রঙলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রঙলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে!

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রঙলাল বলিল, হাতী—হাতী। বলি, ওরে বেটা, কখন আমি হাতী কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রঙলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতী কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতী কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁ রে মুখ্যু, ভাল গরু না হ'লে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত ক'রে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মত, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রঙলাল ধরিয়াছে, এবার সে গরু কিনিবে। এই গরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। রঙলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনও অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিঙ,

সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গরুর মত গরু যেন আর কাহারও না থাকে। গরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিঙ দুইটিতে তেল মাখায়, সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা, কেষ্টের জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রঙলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও মন্দ হয় নাই; এই জন্য এবার রঙলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভাল গরু তাহার চাই-ই। এক জোড়া গরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রঙলালের মমতা নাই। গরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভাল গরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি; আর এবারও যদি ধান ভাল হয়,

তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা ?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রঙলাল জানে না, তবে গরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রঙলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি এক শত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রঙলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হবে ? তুমি গরু কিনে আন না ! কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে।

রঙলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে ?

যশোদার মা বলিল, এ গরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও— এইগুলো বন্ধক দিয়ে গরু কেনো তুমি। ভাল গরু নইলে গোয়াল মানায় ?

সে আপনার গহনা কয়খানি রঙলালের হাতে তুলিয়া দিল। রঙলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রঙলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গরু-

মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মত দুইটি গরু সে সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মত সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে—! ওরে বাস্ রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা! হাজার হাজার না হইলেও গরু মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গরু-মহিষের চিৎকারে, মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রঙলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলা চিৎকার করিতেছে ফেরি-ওয়ালার মত—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

রঙলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনার মনের মত সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রঙলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চিৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মত। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থক্‌থক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রঙলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রঙলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রঙলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হ'ত?

রঙলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হ'ত ?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও।

রঙলালকে ভাল করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রঙলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কি, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই।

রঙলাল বেশ করিয়া দেখিল, সূচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ওই সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মত ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভাল মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রঙলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রঙলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারিপাশেই মহিষের মেলা ; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গরু এ বাগানে নাই। রঙলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতী ? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রঙলাল কখনও দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা ?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কি করবে ? এর হালের মুঠো ধরবে কে ? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রঙলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া

ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মত কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে; পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রঙলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। ওই টাকাতেই তাহার হইল; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যখন দেখিল, সত্যই রঙলালের আর সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রঙলালকে দিয়া দিল। রঙলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ

ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রঙলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মত উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রঙলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রঙলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নিরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে

তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতীই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গরু ভাল নয় বাপু। বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভাল।

একমুখ হাসিয়া রঙলাল বলিল, গরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি ?

হ্যাঁ।

আর এমন ক'রে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে।—যশোদার মা ঝংকার দিয়া উঠিল।

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল, দুগ্‌গা ব'লে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট! এক-একটির কুম্ভকর্ণের মত খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রঙলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চ'লে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা।

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রঙলাল বলিল, অ্যাই, খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল

সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালা-
পাহাড়ের মত চেহারা !

রঙলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক
কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হ'ল
কালাপাহাড়। আর এইটার কি নাম হবে বল দেখি ?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম
কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।
রঙলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোম্ড়া মুখ আমি দেখতে লারি।
—সে গুরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

রঙলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে
দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে
বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে,
তাহা নয়; এটা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে।
বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি, যশোদার মা
পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রঙলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো।
খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রঙলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক। দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রঙলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রঙলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চ'লে যাবি নাকি? এই কাছে-পিঠে চ'রে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রঙলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে। রঙলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মত সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নিচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রঙলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রঙলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে

উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রঙলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রঙলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মত গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রঙলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রঙলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে পূর্বে কয়েক-বার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রঙলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই

বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁ—আঁ—আঁ।

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ।

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রঙলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্য দিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পর মুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে

আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মত বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণ-যন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রঙলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মত চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই-একটা অতিক্ষীণ আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রঙলালের দিকে—চোখ হইতে দরদরধারে জল গড়াইতেছে।

রঙলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ-আঁ করিয়া চিৎকার করে আর কাঁদে।

রঙলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারিখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রঙলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হ'লে—হ্যাঁ।

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব!

রঙলাল বলিল, ওঠ, ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মাশায়, শিগগির এস গো। কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রঙলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রঙলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রঙলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল,

কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই ; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোন-রূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রঙলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রঙলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে নীরবে ভাবিতে-ছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রঙলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রঙলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তরক্ষু লইয়া রঙলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার

মুখটা রঙলালের কোলে তুলিয়া দিল। রঙলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রঙলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চিৎকার আরম্ভ করে, আঁ—আঁ—আঁ!

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রঙলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মত সে তাহাদের পেট-তলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভাল ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালা-পাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রঙলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায় ?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রঙলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁা—আঁা—আঁা !

রঙলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁা-আঁা শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড় ! কালপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রঙলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে ! আমার জান মেরে ফেলাত মশায় !

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু

তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কাহার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চ'লে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রঙলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রঙলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

রঙলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়া-জানা রোজগেরে

ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রঙলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা। এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রঙলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক্, আমি চ'লে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেয়ো। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রঙলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রঙলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রঙলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠি-বর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মত ছুটিল।

কিন্তু এ কি ! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত !

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা ! ওটা কি ?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ ? কার মোষ ?

ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ !

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রঙলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে আর রঙলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ ! কিন্তু এ কি ! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে ? কোথায়, কত দূরে তাহার বাড়ি ?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

নুটু মোক্তারের সওয়াল

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মর্মস্থলনিবাসী কীটের মত এক-একটা সমারোহের আনন্দ-কোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা। কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষ্যে নুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ ঘটিয়া উঠিল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণা, কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহুবিস্তৃত এবং বহুপ্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না, কোন বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কঙ্কণায় নাকি মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন্ অতীতকালে মা-লক্ষ্মী ওই পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া যায়,

সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ানো আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জেদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়। কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণার বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম, তবুও গ্রামের মধ্যে না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তারখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা-বাতাসা ছাড়া আর কোন কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোন মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন, মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে।
দোকানী বলে, আজ্ঞে, সবই ধার, রেখে কি করব বলুন? খাজনায় আর কত কাটানো যাবে? তা ছাড়া আমার দোকানে বাকি বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।
হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন, হাট তো হ'ল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি; মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে! স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, সর্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব? ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসানো হবে না।
ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই-ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তিতর্ক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।
সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়িখানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙিন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। থানার জমাদারবাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই আসিয়াছেন। সদরের

ও মহকুমার উকিল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটিগ্রামের মুচীদের ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালিধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা-চাপকান-পাগড়ি-আংটি-চেন-ঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয়জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই, চোখে চশমা। কর্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল, সকলকেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের একজন উকিল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালি-ধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তারপর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজ সাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন।

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সভাপতি বলিলেন, বলুন, বলুন, যদি কেউ বলতে চান। রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু এবার নুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, নুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন।

নুটুবাবু—নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর মহকুমার মোক্তার। সমবয়সী না হইলেও নুটুবাবুর সহিত মুন্সেফবাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। নুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন আমাকে। সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অনুরোধ করিয়া বলিলেন, না না, বলুন না কিছু আপনি।

নুটুবাবু এবার মোটা দুসুতী চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, সভাপতি মহাশয় এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা নাকি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেইজন্যই আমি কোন কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে, ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছেরও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হ'লে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেইজন্যই বসন্তে নিম্বভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্কণা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'ল আমাদের ধনী মুখুজ্জে-বাবুদের দানে, খুব সুখের

কথা, আনন্দের কথা—ভাল অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, এ হ'ল গরু মেরে জুতো দান, আর জুতো-জোড়াটা ওই মরা গরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা, ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্বল, রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সুদ তস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে তাদের পথে বসিয়ে—

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখুজ্জে-বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

নুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয়, তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতই হাস্যকর। আমার মনে হয়, এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছের সঙ্গে—মেসোপটেমিয়ার

খেজুরগাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় ব'সে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের সুদের হার চক্রবৃদ্ধিহারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা। আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি ক'রে সুদ মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে, তবে কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে আমাদের হেঁসো—খেজুরগাছের গলা কাটবার জন্যে খাঁটি ইস্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।

নুটুবাবু এবার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হ'লে হেঁসো না হ'লে হয় না। হেঁসো চালালে গলগল ক'রে মিষ্টরসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ ক'রে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুক-ফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এজন্যে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দুঁ তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

নুটুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বার-কয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তারপর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ু-প্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে-বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মত ফুলিতেছিলেন।

কোন মতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তারপর মুখুজ্জেরা মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতই, নুটু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সংবাদটা কিন্তু নুটুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া নুটুবাবু হাসিয়া হাত-জোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন নাকি?

না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

তা হ'লে বলুন, নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে তো আপনাকেই বলে—কলিযুগের দুর্বাসা।

ন্টুবাবু বলিলেন, না, তা হ'লে কোন্ দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে সাগরতলে তাঁকে আবার একবার নির্বাসনে পাঠাতাম।

•

ন্টু মোক্তার ওই এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়াছিলেন, সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ওই তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি. এ. পাস করিয়া ন্টুবাবু স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল, শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওই স্বভাবের জন্যই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ।—সেবার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।

নুটুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনিও মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

এ 'কেন'র উত্তর তাঁহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া নুটুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্য-ক্রমে গ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই ভাবেই সে দাসীর মত ব্যবহারই পাইয়াছে।

নুটুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ; তারপর আপন মনেই বলিলেন, দুর্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি। সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নুটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

নুটুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।

তাহার পরই তিনি মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই তিনি মোক্তারি পাস করিয়া রামপুর মহকুমায় প্র্যাকৃটিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক নুটুবাবুর স্ত্রীর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও, একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।

পরিবেশকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তারপর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে নুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার উর্ধ্বতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুটির ঝাড়, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরানো ওদের স্বভাব।

নুটুবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্যভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশি। সে আমলের কোন এক রাজবাড়ীতে শ্রাদ্ধ

উপলক্ষ্যে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, মশায়, স্বয়ং ভগবান ব'লে গেছেন, যদা যদাহি ধর্ম্মস্য—

নুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, জদা জদা নয়, যদা যদা।

নুটুবাবুর পিতার নাম ছিল—কুনো কালীপ্রসাদ। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোন দিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোন দিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত, কি অহংকার লোকটার!

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

নুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ-গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল,

নুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন, কোথায় কাহার কাছে নুটু-মোক্তারের হ্যাণ্ডনোট বা তমস্সুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ নুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জেদের বড়কর্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন ?

কমলপুরেই নুটুবাবুর বাড়ি, তাঁহার জমিজমা, পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে।

সরকার উত্তর দিল, অবস্থা অবিশ্যি তেমন ভাল নয়, তবে ওই চ'লে যায় কোন রকমে সব। দু-এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।

কর্তা বলিলেন, তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল শরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।

মাস চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় নুটুবাবু সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী

বলিল, ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।

নুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, তাকে নাকি কঙ্কণার বাবুরা মারধোর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

নুটুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়মমত সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করিয়া নুটুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কই, দুধ গরম হয়েছে?

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, নুটুবাবু বলিলেন, দেখ, ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে, তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।

স্ত্রী বলিল, বেচারার যে হাপুস-নয়নে কান্না, আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।

মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া নুটুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। নুটুবাবু তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ। কি হয়েছে আগে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

নুটুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, বলি উঠবে, না কি ?

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসংকোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

নুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে বল।

আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হাল পোনা তিন ছটাক, এক পো ক'রে—

তিন ছটাক, এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল।

আজ্ঞে, জোর ক'রে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

তারপর ?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, আর কি করেছেন ?

আজ্ঞে, আমার গরু-বাছুর সব জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

আর ?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, চাপরাসী দিয়ে ধ'রে বেঁধে আমাকে—

আর সে বলিতে পারিল না।

নুটুবাবু বলিলেন, হুঁ। কিন্তু কারণ কি? কিসের জন্যে তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন?

কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, আজ্ঞে, আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, নুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। নুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।

নুটুবাবু বলিলেন, হুঁ, তারপর?

আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত ক'রে বললাম—হুজুর, তা আমি পারব না। তিনি বেরামভন—ভাল লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিব। তাতেই আজ্ঞে—

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক হইয়া মাঠির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ, তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর। দেখ, ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব

দিও। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা আমি তোমার পূরণ ক'রে দেব।

তারপর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খান-কয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত আইন-গুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী জংশন স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক হইয়া নুটুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নুটুবাবু বলিলেন, তুমি তখন থেকে ব'সে আছ মহাভারত? জল তো খেয়েছ, কই তামাক-টামাক তো খাও নি?

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, আজ্ঞে, এই যাই।

নুটুবাবু বলিলেন, তোমার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি পূরণ ক'রে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতিপূরণ তো করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, নুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের

স্নেহস্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, আজ্ঞে বাবু, ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা, এক পো, তিন ছটাকের বেশি নয়।

নুটুবাবু এবার বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন, যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া নুটুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, আজ থেকে আর আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হবে না।

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল, সে কি! ও কি সব্বনেশে কথা!

নুটুবাবু বলিলেন, না, হবে না।

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

নুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনাটার উপরের সাজানো আবরণ খানখান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া

থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু আসিয়া বলিলেন, নুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নুটুবাবু বলিলেন, বলছেন কি আপনি ?

ভালই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্টে যাবেন। তারপর ধরুন, নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে, কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

নুটুবাবু বলিলেন, বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি ছি, কি যে বলেন আপনি নুটুবাবু!

নুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভাল লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে ; পায়ের পথ তো সংকীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত।

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভাল। উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই !

তারপর কিন্তু আর ও-প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিস্‌মিস হইয়া গেল। ন্টুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ ও লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খান-দশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মত আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম

দিয়েছে! ধেই-ধেই ক'রে নাচছে গো সব! নুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়া ছিলেন, তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণায় বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই, কিন্তু নুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর—আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য, গোঁয়ার মহাভারত কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া

পড়িল না। নুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে, বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়্। জলে বাস ক'রে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে ?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ ক'রে মরাই ভাল।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, আলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, আলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কি বল্ ? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চিৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গী করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই, চণ্ডাল কসাই।

দুই দিন পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নারী ও বালকের আর্ত্ত চিৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল,

মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মমভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহু কষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, জল !

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা।

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, মহাভারত !

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চিৎকার করিয়া উঠিল, মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি ?

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, আরে শোন্, শোন্।

কোন কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, খট খট লবডঙ্কা, খট খট লবডঙ্কা, আর আমার করবি কি ?

গোমস্তা মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, জানিস বেটা চাষা, পৃথিবীটা কার বশ?

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হইতে নুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া নুটুবাবু উকিলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকিল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

এবার কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নুটুবাবুর তদ্বিরে তদারকে স্বয়ং এস. ডি. ও. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব-গোমস্তাকে পর্যন্ত আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। নুটুবাবু নিজেও সদরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নয়, সরকারী উকিলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকার লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া নুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, মিটিয়ে ফেলুন, তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।

নুটুবাবু বলিলেন, বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোসে মেটে? কোন কালে মেটে নি, মিটবেও না।

শেষ পর্যন্ত বলিলেন, বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে ক'রে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না হয় দেখি।

প্রস্তাবকারীরা মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল। বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকিলের সম্মতিক্রমে নুটুবাবু প্রথমে সওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, ধনীর অপরাধে ধনীর অনুগ্রহপুষ্ট দুর্বলের ওপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া আজ ধর্মাধিকরণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে বিচার একজন করবেন

—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন; তিনি বলেছেন, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God." (ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটের প্রবেশও সহজ)।

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকিল আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বিচারে অপরাধীদের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে নুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল ব'সে আছে।

নুটুবাবুর মাথায় তখনও ওই মকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, একটা দায়রা, আর দুটো এস. ডি. ও.-র কোর্টের মামলা। ফী বলেছি চার টাকা ক'রে।

পিছন হইতে একজন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, চমৎকার আর্গুমেণ্ট হয়েছে! এবার কিন্তু

ছেঁড়া জুতো-জামা পাল্‌টাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে, তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব। নুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, পাঠিয়ে দিও। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না।

বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহিত নুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল। পনরো বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া নুটুবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ির ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়-কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজো তরফের কর্তা। নুটুবাবুর দারোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া আসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কর্তা ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, তাই তো হে, নুটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে, অ্যাঁ! বাঃ বাঃ বাঃ, বলিহারি, বলিহারি!

কর্তার পুত্র একজন খানসামাকে বলিলেন, একবার উকিলবাবুকে খবর দাও দেখি, বল, কঙ্কণার বড়কর্তা সেজোকর্তা এসেছেন।

নুটুবাবু বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ!

বড়কর্তা বলিলেন, সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে?

নুটুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোন মানুষে পারে?

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে বড় উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়। দেখি, কে হারে!

নুটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বেশ, এখন বসুন।

বড়কর্তা বলিলেন, ধর, তোমার বাড়ি ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!

নুটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আপনারা

ভিক্ষে চাইবেন, এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষা চাওয়া! বেশ, আগে বস্থন।

বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু। আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি, নইলে যাই।

নুটুবাবু বলিলেন, বেশ বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয়, তবে দেব আমি।

বড়কর্তা বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

তাঁহার পুত্র আসিয়া নুটুবাবুর হাত ছুইটি চাপিয়া ধরিল। নুটুবাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজোকর্তা বলিলেন, তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ.-তে এম.এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে; তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে, সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।

নুটুবাবু বড়কর্তার এবং সেজোকর্তার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন, আপনাদের নাতনী আমার বাড়ি আসবে, সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।

সমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল, সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয়স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় লয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলার জ্বালায় ছবি-ফুলদানিগুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

নুটুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ঈজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ওই কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ, বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার ফাউণ্টেন-পেনটা পাওয়া যাইতেছে না। নুটুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের শ্যামাঠাকরুণকে আজই বাড়ি যেতে ব'লে দাও।

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, তাই কি হয়? নিজে থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়? আপনার লোক।

নুটুবাবু বলিলেন, আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, দোহাই তোমার, বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়ে-থুয়ে দাও, চ'লে যাক ওরা, নইলে ঘরদোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে।

গৃহিণী একটু বিব্রতভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। নুটুবাবু ক্লান্তভাবেই চেয়ারে শুইয়া, বোধ করি, পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া রায়ের নথি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল।

নুটুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মকদ্দমার রায়ের নকল। মকদ্দমাটায় নুটুবাবুর অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে নুটুবাবুর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচারপদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি

আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম হুটপাট শব্দে ওই আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান, রক্ষে কর। চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলা চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলা দেখিতে দেখিতে একখানা অতি পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ, পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুরই চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

যাবার বাতিক অসম্ভবরূপে প্রবল হ'লেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হ'ল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বউমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাক-যোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে লিখিয়াছেন—

আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন, মা-লক্ষ্মীর অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ ক'রে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি 'পথের ধুলোয় নামাব' বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই

লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধ'রে পারা যায় না। মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি—টাক পড়েছে, টাক ?

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মত তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মূহূর্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মূহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মত তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হি-হি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফবাবুর ব্যঙ্গহাস্য-বক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। রতনপুরের কালীর মা, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুণ উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কি তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। মহাভারত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, পারুলের শ্যামাঠাকরুণ বাড়ি যাচ্ছেন, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

নুটুবাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কই, দরজা কই ?

আখ্ড়াইয়ের দিঘি

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জ্বলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজসরকার পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না তদন্তের জন্য রাজকর্মচারী-মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাব্‌ডিভিশনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি. এস. পি., সুরেশবাবু ডেপুটি আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীত কালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গো-পথের মত মানুষের অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোনরূপে তিন জনে এক পাশের পায়ে-চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্নবেলা। দগ্ধ আকাশখানা ধুলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের রেশ নাই। হু-হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া লইতেছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক

বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধু-ধু করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছাপের মত বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন। তিন জনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, কই মশাই, সামনে গ্রামের চিহ্ন যে দেখা যায় না, এদিকে দিবা যে অবসানপ্রায়।

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলানো বাইনাকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন, দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্তত পাঁচ-ছ মাইল হবে। রজতবাবু রিস্ট-ওআচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, পৌনে ছটা। এখনও আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে তো একবিন্দু জল আর নেই। আপনাদের অবস্থা কি?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমারও তাই। সুরেশবাবু, আপনার অবস্থা কি? আপনি যে কথাও বলেন না, দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নয় যেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই বর্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূর অতীতের কথা ভাবছিলাম আমি।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, অতীত যখন, তখন ইণ্টারেস্টিং নিশ্চয়, তৃষ্ণানিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে। গাড়িতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে শুরু করুন। আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মত গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশাই।

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার জল এখনও আছে। জল পান ক'রে একটু সুস্থ হন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন, আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, আপনাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম?...বেশ, এইবার কি বলছিলেন বলুন—একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন, যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা, এ রাস্তাটার নাম জানেন ? এইটেই অতীতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোন পথিক কোনদিন জলের জন্য চিন্তা করে নি। ক্রোশ-অন্তর দিঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ এ পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। দিঘিগুলি এখনও আছে—

বাধা দিয়া রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার ?

ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে—এক মসজিদের আজানের শব্দ যত দূর পর্যন্ত যাবে, তত দূর বাদ দিয়ে আর-একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। একদিন ভাবুন—দেশ-দেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসঙ্গে আজান-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই—ওই দেখুন, পাশের ওই যে ইটের স্তূপ—ওটি একটি মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দিঘি আছে। তাই বলছিলাম, এ রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবে নি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, বাদশাহী সড়ক যখন, তখন কোন বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়। কিন্তু কোন্ বাদশাহের কীর্তি মশাই ?

ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এ দেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নাকি কোন বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ ফকিরের দর্শন পান। সেই ফকির তাঁর অদৃষ্ট গণনা ক'রে বলেন, রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকিরকে ধরলেন—এর প্রতিকার ক'রে দিতে হবে। ফকির হেসে বললেন—প্রতিকার? মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার ক্ষমতা? বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন—তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে পাশে ক্রোশ-অন্তর দিঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর।

সুরেশবাবু নীরব হইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, তারপর মশাই, তারপর?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, তার পর বুঝুন না কি হ'ল। আজকাল গল্প সাজেস্‌টিব হওয়াই ভাল। বাদশাহ রাজধানী পৌঁছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই সব দিঘি, এতগুলি মসজিদ তৈরি করতে করতে যত দিন লাগে, তত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন, হাম্‌বাগ, বাদশাহটি একটি ইডিয়ট ছিলেন বলতে হবে। তিনি তো পথটা শেষ না করলেই পারতেন— আজও পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

রমেন্দ্রবাবু গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন, দাঁড়ান মশাই, এই পথের ধুলো আমি খানিকটে নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইট।

সুরেশবাবু কহিলেন, আর একটা কথা শুনে, তারপর। পথ তো ফুরিয়ে যায় নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন, সেটা আবার কি?

এ দেশে একটা প্রবচন আছে, সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিস-রিপোর্টে সেটা আছে—

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, চুলোয় যাক মশাই পুলিস-রিপোর্ট। কথাটা বলুন তো আপনি।

তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে 'আখড়াইয়ের দিঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি'। এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুরপুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীর ঘাঁটিতে তারা রাত্রে এই পথের

উপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখ্‌ড়াইয়ের দিঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন, ও, তাই নাকি! এই সেই জায়গা?

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন, এখনও পুজোর আগে এখানে চৌকিদার রাখবার ব্যবস্থা আছে।

আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়িখানি এই সময় একটা গর্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিলেন। গাড়িখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। একখানা চাকা ধাক্কায় বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ যে মহাবিপদ হ'ল সুরেশবাবু! কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গো-যান না এলে তো উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখনও গাড়িখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন, ঘাড়ে তুলুন মশাই বাহনকে। তবু একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান দেখে নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলানো ব্যাগ হইতে টর্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোকরেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া সুরেশবাবু কহিলেন, এই যে সম্মুখেই বোধ হয় আখ্ড়াইয়ের দিঘি। চলুন ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগ্য পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন, আর বাহাদুরপুরের দু·একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, সে উত্তমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না। কি বলেন?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়া রজতবাবু কহিলেন, তাতে রাজি আছি।

প্রকাণ্ড দিঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে বিকট দৈত্যের মত মনে হইতেছিল। চারিদিক অন্ধকারে থমথম করিতেছে। দিঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রানা। একদিকের রানা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাতের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।
ঘাটের চত্বরটির মধ্যস্থলে তিনজনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক পাশে সাইকেল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা শতরঞ্চি রমেন্দ্রবাবুর গাড়ির পিছনে গুটানো ছিল, সেইখানা পাতিয়া রমেন্দ্রবাবু বসিয়া ছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।
সুরেশবাবু বলিলেন, সাবধানে পায়চারি করবেন রজতবাবু।

অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখেছেন তো খাদটা ?

হাতের টর্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন, দেখেছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন, উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙা রানাটার ইটের ওপর পড়লে হাড় চুর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিলেন। আলোক নিবিবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিক্প্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, কে কি ভাবছেন বলুন তো ?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে! কি বলুন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চের শিখা দিঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজতবাবু কহিলেন, কই ?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওপারে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মত— মানুষের মত কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হ'ল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, দিঘির গর্ভের কোন অশান্ত প্রেতাত্মা হয়তো। কিংবা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন, সে হ'লে তো মন্দ হয় না, একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়, সময় কাটে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু হ'লেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার। ওটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের গোড়ায়। সচকিত আলোয় দেখা গেল, সেটা একগাছা ছিন্ন দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন, গুড্ লাক্!—রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই। কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি মৃদুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দিঘির ওদিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল। শব্দে মনে হয়, কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চের আলো অত দূর পর্যন্ত যায় না। আলোকধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার সুনিবিড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, এখনও বলবেন আমার ভ্রম!

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ভ্রমই বোধ হয়। জলচর কোন জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিক একটা অশান্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নাঃ, শুধু রমেন্দ্রবাবুকে দোষ কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছি মশাই। নিন, একটা ক'রে সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন, না মশাই, একেই আমি ওতে অভ্যস্ত নই, তার ওপর খালি পেটে শুকনো গলায় সহ্য হবে না, থাক্।

আসুন তবে রমেনবাবু, আমরা দুজনেই— ও কি ?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিন জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগতভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, তারা, তারাচরণ! এইখানেই তো ছিল! কোথা গেল ?

রজতবাবুর হাতের টর্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জ্বলিয়া উঠিল।

রমেন্দ্রবাবু ত্রস্ত স্বরে বলিলেন, এদিকে, এদিকে, ভাঙা রানাটার

পাশে জলের ধারে। ওই—ওই। কিন্তু দপ দপ ক'রে জ্বলছে কি? চোখ কি? ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারে দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া ছিল। আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস-লক্ষ্যে মুখ ফিরাইল। রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চটা নিবিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত, অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্তি!

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন। অস্বাভাবিক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জ্বলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল। সে মূর্তি ধরণীর সজীবতার সর্বমাধুর্যবর্জিত, মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবুও তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কে? কে তুমি? উত্তর দাও। কে তুমি?

নিথর নিস্তব্ধ মূর্তির মুখের পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে অধররেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র, তেমনই ভয়ংকর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপিলেন। সুগভীর গর্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষনীড়াশ্রয়ী পাখির দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকট হিংস্র গর্জন করিয়া সে বিকট মূর্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্তি তখন জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ হাতের টর্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মত একটা আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু শিগ্‌গির টর্চটা জ্বালুন। আমারটা কোথায় প'ড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জ্বলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন, মানুষই। কিন্তু ম'রে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নিচু ক'রে পড়েছে। ঘাড় ভেঙে গেছে।

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্ধ-প্রোথিত হইয়া

গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে ঊর্ধ্বমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কে? ও কি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগসহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন, গাড়ি—গরুর গাড়ির শব্দ।

গন্তব্য থানায় পৌঁছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিন বন্ধুতেই নীরব। একটা বিষণ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়িতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামানো হইলে রজতবাবু সাব্-ইন্সপেক্টরকে বলিলেন, লোকটাকে এখানকার কেউ চিনতে পারে কি না দেখুন তো।

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, চেনেন আপনি?

না। কিন্তু এ কি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, আমি চিনি স্যার। এ একজন দ্বীপান্তরের আসামী। আজ দিন দশেক খালাস হয়ে বাড়ি এসেছে। সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে। বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগদী।

বেশ। তা হ'লে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখ তো সেগুলো কি ?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়, ছোট ঘটি একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকদ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, হাইকোর্টের কোন উকিলের লেখা—এরূপভাবে দণ্ডাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেই-জন্য ফিরত পাঠানো হইল।

রজতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—

সেসন্স কোর্টের নথি। ১৯০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট—বাদী, আসামী—কালীচরণ বাগদী।

অভিযোগ—আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগদীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিন জন।

প্রথম সাক্ষী মোবারক মোল্লা। এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নান্‌কারদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করেন, কালীচরণ বাগদীকে আপনি চেনেন ?

উত্তর—হ্যাঁ। এই আসামী সেই লোক।

কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ ?

দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

আপনার সঙ্গে কি কালীচরণের কোনও ঝগড়া আছে?

না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি।

তারাচরণ বাগদীকে আপনি জানতেন?

হ্যাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে, কালীচরণ তারাচরণকে ভাল দেখতে পারত না?

না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন দুর্বল ছিল ব'লে ওস্তাদের ছেলেতে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মত না হয়, তবে সে ছেলে নিয়ে করব কি?

তারপর, বরাবরই তো সেই রকম ভাব ছিল?

না। তারাচরণ বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হতে আরম্ভ হ'লে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

কালীচরণ কি তারাচরণকে আখড়ায় মারত না?

হ্যাঁ, ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে ব'লে দাবির ওপর—

থাক্ ও কথা। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, কুলীর ঘাঁটিতে রাত্রে পথিক খুন হয় ?

জানি। শুনেছি বহুকাল থেকে—বোধ হয় একশো বছর ধ'রে এ কাণ্ড ঘ'টে আসছে।

কারা এসব করে জানেন ?

না।

শুনেন নি ?

বহু জনের নাম শুনেছি।

আপনাদের গ্রামের বাগদীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্ব-পুরুষ, এদের নাম শুনেছেন কি ?

শুনেছি।

সরকারপক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগদিনী। মৃত তারাচরণ বাগদীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল ?

না।

কখনও ঝগড়া হ'ত না।

ঝগড়া হ'ত বইকি। কতদিন টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু তাকে ঝগড়া থাকা বলে না।

কিসের টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া ?

খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর, আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

কেমন ক'রে জানলে তুমি ?

বাড়িতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপ-বেটার কথাবার্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্ত-মাখা টাকা গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি।

তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান ?

জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

বিচারক প্রশ্ন করেন, তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ ?

হ্যাঁ হুজুর, সমস্ত দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন, কি দেখেছ তুমি, আগাগোড়া বল দেখি ?

সরকারপক্ষের উকিলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সাক্ষীর উক্তি—

হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের সাতাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশে তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্বসজ্জন এসেছিল। জাত-বাগদী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোট জাতের আমোদে-আহ্লাদে মদই হ'ল, হুজুর, প্রধান জিনিস। বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাঁটি-খেলা খেলেছে।

বিচারক প্রশ্ন করেন, ঘাঁটি-খেলা কি ?

হুজুর, ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন ভাবে লাঠি খেলে, গেরস্তর ঘর চড়াও ক'রে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাঁটি-খেলা। সেই খেলা খেলতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন-তিন বার আমার স্বামী আমার দাদার ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলেখেলা ভাল লাগে না বাপু, যদি মরদ তোদের কেউ থাকে, তবে নিয়ে আয়। সেই নিয়ে ঝগড়া। মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই নিয়ে কুলের খোঁটা। স্বামী আমার তখনই উঠে প'ড়ে সেখান থেকে

চ'লে আসে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে নি হুজুর—তা হ'লে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম, তখন সে বেরিয়ে চ'লে গেছে। আমিও আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হ'ল না।

সাক্ষী কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিল, অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না, এমনিই অন্ধকার। পিছল পথে বার বার পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের বাইরে এসে আমি চিৎকার ক'রে ডাকলাম—ওগো, ওগো! ঝিপঝিপ ক'রে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের গোঙানিতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নাই। শুনলে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল, বাতাসে সে গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পর সে আবার আরম্ভ করিল—

আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনে থেকে জলের

ফোঁটা কাঁটার মত মুখচোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চিৎকার-শব্দ কানে এসে পৌঁছুল—বাবা, বাবা। শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম আমার স্বামীর গলা, ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে প'ড়ে গেলাম। উঠে একটু দূরে এগিয়ে যেতেই দেখি, একজোড়া আঙরার মত চোখ ধকধক ক'রে জ্বলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম, সে আমার শ্বশুর। আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেড়ালের চোখের মত খয়রা-রঙের, সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চ'লে চ'লে চোখে তখন অন্ধকার স'য়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম, আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখ্ড়াইয়ের দিঘির পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়া বিচারক প্রশ্ন করিলেন, তোমার ভয় হ'ল না?

সাক্ষী উত্তর দিল, হুজুর, আমরা বাগদীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত, তবে ওই খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে, সে বলিতে সমর্থ এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল, তারপর দিঘির গর্ভে দেহটাও পুঁতে দিলে সে, আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম, খুনী আমার শ্বশুর। সে বাড়ির দিকে হনহন ক'রে চ'লে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই। বাড়িতে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, চিনলাম, সে আমার শাশুড়ীর গলা, কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি তার মুখ চেপে ধরেছিলাম। হুজুর, আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব ব'লে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল, হুজুর, আমরা জাতে বাগদী, আমরা এক-কালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরব লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকে আমাদের এই ব্যাবসা। হুজুর, চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হ'ল মেয়ের জাত। জমিদার বড়লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হ'ত। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে থানা পুলিসের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিকে থাকল, তারা শিঙ ভেঙে ভেড়া—ভালমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো ঘুরিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধ'রে আমরা এই ব্যাবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগদিগিরি লোক-দেখানো পেশা ছিল আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওত পেতে ব'সে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার

ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত 'ফাবড়া'—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হ'ত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধ'রে দেহটা উলটে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত।

এই সময় একজন জুরি অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন বিচারক ও জুরিগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

কত মানুষ যে খুন করেছি, তার হিসেব আমার নেই। সে সময় কোন কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরানি যদি সব কানে আসত, মনে থাকত, হুজুর, তা হ'লে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দুটি মানুষের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি হাতে-খড়ি নিই আর আমি আমার ছেলে তারাচরণকে যেদিন হাতে-খড়ি দিই,

এই দুদিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম—দে, পা দুটো ধ'রে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থরথর ক'রে কেঁপে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। আমিই শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল, প্রথম দিন আমিও এমনই ক'রে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যেসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পালকের মত পাতলা পা, পাথরের মত শক্ত ছাতি, শিকার পথের উপর পড়লে আমি যেতে না-যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ ক'রে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল, সে দিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয়তো যাদের খুন করেছি, তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে, এ আমি জানতাম। আমার বাবা বলেছিল, আমাদের বংশ থাকবে না—নিব্বংশ হতেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল, আর শেষ হয়েছে হুজুর; তবে আর একটু জল। পুনরায় জলপান করিয়া সে বলিয়া গেল—

সেদিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই সে চ'লে আসবে, এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপঝিপ ক'রে বাদলও নেমেছিল। আমার বউমার কাছে শুনেছেন, আমার চোখ অন্ধকারে বেড়ালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন আমি মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। দুপহর রাত পর্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি, এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাস বইছিল আমার দিক থেকে। আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক মেরে অভ্যেসমত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল,—মারলাম ফাবড়া। লাস পড়ল। সে কি চিৎকার ক'রে বললে, কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব, শুনলাম, বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না, তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির ওপরে দাঁড়িয়ে বললাম, এ সময়ে বাবা সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল, পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্বে লিখিয়াছেন—যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমা-রেখার নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহারই নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধ হেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র চরমদণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেই জন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন। চরমদণ্ড এ ক্ষেত্রে সে গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে

পারিলাম না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

রায় শেষ হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধ হয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, একটা কথা বলব সুরেশবাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন, বলুন।

পুলিস এক্‌স্‌কিউটিভ আপনারা দুজনেই তো এখানে উপস্থিত রয়েছেন। দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ওই আখ্‌ড়াইয়ের দিঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

ব্যাধি

সূর্যোদয়ের পূর্বেই পাখির প্রভাতী কলরবের সঙ্গে সঙ্গেই সেতারপর্ব শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন তানপুরায় ঝংকার তুলিয়া হারাণ আচার্য সাধিতেছিল একখানি ভৈরবী। আবেশে তাহার চোখ দুইটি মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। তানপুরার উপর গাল রাখিয়া সে গাহিতেছিল—'চরণে চন্দন রাঙা জবা দিলে কে রে!'

রুদ্রমূর্তিতে একগাছা লাঠি হাতে ও-পাড়ার শ্যাম ঘোষাল আসিয়া বিনা ভূমিকায় হুংকার ছাড়িয়া ডাকিল, হারাণে!

তানপুরাটার স্ফীত উদরের উপর বাঁ হাতে তালি মারিয়া হারাণ তাল দিতেছিল। ফাঁকের ঘরে বাঁ হাত তুলিয়া হারাণ ইশারা করিল, সবুর। গানটা উপভোগ্যরূপে জমিয়া উঠিয়াছিল। ঘোষাল বসিল। যথাসময়ে গান শেষ করিয়া হারাণ তানপুরা-খানি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিতে দিতে কহিল, কি?

ঘোষালের রাগের সময় বোধ করি পার হইয়া গিয়াছিল। সে কাকুতি করিয়া বলিল, হারাণ, আমার ঠাকুর?

হাতের মেরজাপটা খুলিয়া হারাণ কহিল, জানি না তো।

ঘোষাল জোড়হাত করিয়া বলিল, দে ভাই, কোথা রেখেছিস। কি, ফেলে দিয়েছিস, বল্।

হারাণ বলিল, তোমার ঠাকুর তো আমি দেখেছি বাপু ; আনা-টেক সোনার একটা পুটপুটে পৈতে ছিল। সে আমি হাত দিই নাই। ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ আমি করি না।

ঘোষাল আরও মিনতি করিয়া বলিল, তোর পায়ে ধরি ভাই, আমার তিনপুরুষের শালগ্রামশিলা, দে ভাই। বল্, কোথায় ফেলে দিয়েছিস ?

হারাণ কহিল, বিশ্বাস না কর তো কি বলি, বল। সত্যিই আমি জানি না।

ঘোষাল আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, সে রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কহিল, কুষ্ঠব্যাধি হবে, মুখ দিয়ে পোকা পড়বে। চণ্ডাল—চোর—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—

হারাণ কোনও উত্তর দিল না। সে তানপুরাটা আবার কোলের উপর উঠাইল।

ঘোষাল সরোষে কহিল, দিবি না তুই ? আমি পুলিসে খবর দেব—

হারাণ অবিচলিতভাবে তানপুরার তারের উপর আঙুল চালাইয়া দিল। সুরঝংকারে যন্ত্রটা সাড়া দিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঘোষাল তাহার পায়ের গোড়ায় ক্ষিপ্তের মত মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল, মরব, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

তাহার স্বর অবরুদ্ধ, চোখ দিয়া দরদরধারে জল ঝরিতেছিল। হারাণ বলিল, কেন মিছে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ছ ঘোষাল ? যাও না, ভাল ক'রে সব খুঁজে পেতে দেখ না গিয়ে। গোল পাথর তো গ'ড়ে-ট'ড়ে প'ড়ে গিয়ে থাকবে। পুষ্পকুণ্ড-টুণ্ডগুলো দেখগে যাও।

ঘোষাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল, পাব—পাব, পুষ্পকুণ্ডের মধ্যেই পাব হারাণ ?

দেখই না গিয়ে।

ঘোষাল দ্রুতপদে চলিয়া গেল, হাতের লাঠিগাছটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। যন্ত্রটায় ঝংকার তুলিয়া হারাণ এবার ধরিল একখানি বাগেশ্রী। গান চলিতেছিল, নিশি স্বর্ণকার আসিয়া দাওয়ার উপর নীরবে বসিল। গান শেষ করিয়া হারাণ বলিল, একবার তামাক সাজ্ দেখি নিশি।

হারাণের ঘরদুয়ার নিশির পরিচিত, সে তামাক টিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। যন্ত্রের তারগুলি শিথিল করিয়া দিয়া

কাপড়ের খোলের মধ্যে সযত্নে যন্ত্রটিকে পুরিয়া দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল।

নিশি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে কহিল, একজন খরিদ্দার এসেছে দাদাঠাকুর। কিছু সোনা বেচবে? দরও এখন উঠেছে—চব্বিশ দশ আনা পাকা বিকুচ্ছে।

হারাণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

নিশি ডাকিল, দাদাঠাকুর!

মৃদুস্বরে উত্তর হইল, না।

নিশি মৃদুস্বরে বলিল, কি করবে এত সোনা নিয়ে? আমিই তো গালিয়ে বাট তৈরি ক'রে দিয়েছি—দেড় সের সাত পো তো হবেই। কিছু ছেড়ে দাও এই সময়, বুঝলে?

টাকা নিয়েই বা কি হবে আমার?

জমি-টমি কেনো। কিংবা দাদন-পত্র কর। এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর, বুঝলে? আজন্মই কি এমনই ক'রে কাটিয়ে দেবে না কি?

হারাণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। নিশি কলিকাটা কোলের কাছে নামাইয়া দিল, বলিল, খাও। আরও একটা কথা দাদাঠাকুর,—ওসব কাজ এইবার ছাড়। আর কেন?

ঠাকুর-দেবতার অলংকার—ও আর ছুঁয়ো না। ও হচ্ছে কাঁচা পারা—হজম কারও হয় না।

এতক্ষণে হারাণ কথা কহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মৃদুস্বরেই বলিল, এই দেখ্ বাবা—হাত দেখ্, পা দেখ্, শরীর দেখ্, খ'সেও যায় নি, রোগও হয় নি। আর নিতেই যদি হয়, তবে দয়াল দেবতার নেওয়াই ভাল। ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে দেখে, ধরে না, কাউকে ব'লে দেয় না, চ্যাঁচায় না, দুঃখ করে না। কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনাদানা—রামচন্দর! কাল রাত্রে বুঝলি, ওই ঘোষালদের ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছিলাম। গোল একটা নুড়ি, তাকে বেড় দিয়ে একটা সোনার পৈতে। নিলাম টেনে ছাড়িয়ে, তারপর ভাবলাম, দিই ছুঁড়ে ফেলে। আবার ভাবলাম, থাক্, এই পুষ্প-কুণ্ডের মধ্যেই থাক্। আবারও তো পৈতে গড়িয়ে দেবে—সেইটাই হবে হাতের পাঁচ। নে, কল্কে নে।

নিশি কহিল, আচ্ছা, এসব যে তুমি করছ—কি জন্যে, কার জন্যে করছ বল তো? না করলে সংসার, না কিনবে সম্পত্তি, কি হবে এতে তোমার?

হারাণ বলিল, কল্কেটা পালটে সাজ্, ওটাতে আর কিছু নাই। তারপর গুন্ গুন্ করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি আবার তামাক সাজিতে বসিল। টিকাতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল, জিনিসগুলো যত্ন ক'রে রেখেছ তো দাদাঠাকুর? দেখো, চোরের ধন বাটপাড়ে না নেয়!

মৃদু হাসিতে হাসিতে হারাণ বলিল, সে এক ভীষণ কেলে সাপ, ইয়া তার ফণা—আমি যে ওস্তাদ, আমাকেই বলে—। দুইটি হাতের তালু পাশাপাশি যোগ করিয়া ফণার পরিধি বর্ণনা করিতে করিতে হারাণ সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

দিন দশেক পর।

সেদিনও নিশি বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। হারাণ কতকগুলি টুকরা টুকরা কাঠি লইয়া ছোট ছোট আটি বাঁধিতেছিল। নিশি কহিল, এর মধ্যে নবগ্রহের ন রকম শুকনো কাঠ কোথা থেকে যোগাড় করলে দাদাঠাকুর? তোমাদের দৈবজ্ঞিদের সন্ধান বটে বাপু।

হারাণ বলিল, তুইও যেমন, দেবে তো চার আনা পয়সা, তার জন্যে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় আনন্দ-কাঠি, কোথায় এ, কোথায় তা যোগাড় ক'রে বেড়াই আমি! নিয়ে এলাম শুকনো ডাল একটা, তাই বেঁধে আটি ক'রে দিচ্ছি। এই কি

দিতাম ? বছরে বছরে রায়পুরের বাবুদের বাড়ি একটা ক'রে পার্বণী দেয়, তাই, নইলে—হ্যাঁঃ।

কিন্তু দেবকার্যের জিনিস, শান্তি-স্বস্ত্যেন করবে তারা।

মৃদু হাসিয়া হারাণ বলিল, আমাকে তো সবাই জানে বাবা, জেনেশুনে সব আমার কাছেই বা আসে কেন ? গ্রহের ফেরে যজ্ঞ তাদের পূর্ণ হবে না, তার আর আমি কি করব ?

একটি লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, 'নব-গেরোণে'র কাঠ নিতে এসেছি।

হারাণ বলিল, এই যে বাবা, বেঁধে ব'সে আছি আমি। তোমার বাড়ি রায়পুর তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পয়সা এনেছ—চার আনা পয়সা ?

লোকটি একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

হুঁকা কলিকা হারাণের হাতে দিয়া নিশি বলিল, এ কিন্তু তোমার ভাল নয় দাদাঠাকুর, যাই বল তুমি, এতদিন বিদেশে-বিভুঁয়ে যা করেছ ধরতে পারে নাই কেউ, এবার তুমি গাঁয়েও আরম্ভ করলে ? আবার এই লোক-ঠকানো—

হারাণ হুঁকায় টান দিয়া বলিল, আর বুঝি জল হয় না, মেঘ ধ'রে গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশি

বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল, ঘোষাল পুলিসে ডায়েরি করেছে, শুনেছ ?

হারাণ বলিল, মিছে কথা। হ'লে এতদিন খানাতল্লাস হয়ে যেত। আর করলে তো করলে, সাক্ষী প্রমাণ তো চাই।

একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। ও-প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া হারাণ প্রশ্ন করিল, কোথাকার গাড়ি হে ?

গাড়োয়ান গাড়ি নামাইতেছিল। ছইয়ের মধ্য হইতে একটি বিধবা মুখ বাড়াইয়া কহিল, ভাল আছ দাদা ?

হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণ সবিস্ময়ে কহিল, কে রে,— হৈম ? তুই হঠাৎ যে ?

গাড়ি হইতে হৈম নামিয়াছিল, পিছনে তাহার বালক-পুত্র তমোরীশ। দাদার পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৈম বলিল, বন্যেতে বাড়ি ঘর সব প'ড়ে গিয়েছে দাদা। এমন আচ্ছাদন নাই যে, মাথা গুঁজে দাঁড়াই। কোথা, কার কাছে দাঁড়াব, বল ? অবস্থা তো জান। ঘর যে আবার ক'রে নিতে পারব, সে সম্বলই বা কোথা ? ভগবান শেষকালে তোমারই কাছে দাঁড় করালেন আমাকে।

হারাণ কহিল, তা বেশ বেশ। তোরও তো বাপের ঘর।

আয় ভাই, আয়। বেশ করেছিস। তমোরীশেরই তো সব—দু-দিন আগে আর পরে।

নিশি কহিল, তা বইকি, এ গুষ্টির অধিকারীই তো উনি।

হৈম আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ছেলেকে ভর্ৎসনার সুরে বলিল, মামাকে প্রণাম কর তমোরীশ। ছিঃ, এত বড় ছেলে, এও ব'লে দিতে হবে ?

কোলের কাছে ফুটফুটে ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া হারাণ বলিল, বকিস নে হৈম, অচেনা জায়গা, আমিও অচেনা—

মৃদু অনুযোগ করিয়া হৈম বলিল, চেনা না দিলে চিনবে কি ক'রে, বল ? এই তো দশ কোশের মাথায় থাকি। মলাম কি থাকলাম, বোনের খোঁজও তো নিতে হয়। শেষ গিয়েছ তুমি, আমি বিধবা হ'লে—সে আট বছর হ'ল। তমোরীশ তখন দু-বছরের ছেলে, কেমন ক'রে চিনবে, বল ?

লজ্জিত হইয়া আচার্য কহিল, আয়, আয় ভাই, বাড়ির ভেতরে আয়।

তমোরীশকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

গৃহিণীহীন গৃহখানিতে আবর্জনা না থাকিলেও মার্জনার পারিপাট্য নাই, অভগ্ন অবয়ব হইলেও সম্পূর্ণ নয়, গৃহের মধ্যে যে একটি শ্রীময়ী মমতা থাকে, তাহা নাই।

হৈম বলিল, মায়ের আমলে কি রূপই ছিল এই ঘরের! সেই ঘর!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারাণ নিশিকে ডাকিয়া কহিল, চার পয়সার ভাল মিষ্টি এনে দে দেখি নিশি। ছেলেটা প্রথম এল—

সিকিটা হাতে লইয়া নিশি বলিল, ডাল নুন তেল কি আর কিছু যদি আনতে হয়, একেবারে আনতে দাও না।

দৈবজ্ঞের বাড়ি রে এটা, ভুজ্যির ডাল নুন আছে। দু-পয়সার তেল আনিস বরং। আর ভাবছি—মশারি একটা চাই আবার, যে মশা এখানে। বারো আনার কমে হবে না, কি বলিস? তোর ঘরে বাড়তি নেই রে?

খিড়কি হইতে ফিরিয়া হৈম কহিল, ছি ছি দাদা, ঘাট-পাঁদাড়গুলো ক'রে রেখেছ কি? জঙ্গলে যে মানুষ ডুবে যায়! বিয়েও করলে না দাদা, এবার তোমার বিয়ে দোব আমি।

আচার্য নিশিকেই বলিল, না থাকলে কি আর হবে! তা হ'লে রামা তাঁতীকে বলবি একটা মশারির জন্যে। নিয়েই বরং আসবি। ওর ছেলের রাশি-চক্রটা দিয়ে যেতে বলবি, কুষ্টি ক'রে দেব।

নিশি বলিল, সে আমি পারব না বাবু। তুমি একটা মিথ্যে যা-তা কুষ্টি ক'রে দেবে, সে পাপের ভাগী আমি হই কেন! তার চেয়ে আমি নিজে দায়ী হয়ে নিয়ে আসব। তুমি পয়সা পরে দিয়ো আমাকে।

সে চলিয়া গেল।

নিশি চলিয়া যাইতেই হৈম বলিল, একটি কাজ তুমি করতে পাবে না দাদা। তোমার পায়ে আমি হত্যে দেব। ঠাকুর-দেবতার জিনিস—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আচার্য কহিল, না, সে তো আর করি না।

নিশীথ-রাত্রে হ্যারিকেনটি অনুজ্জ্বল করিয়া দিয়া হারাণ খিড়কির ঘাটে গিয়া নামিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আলোকটি উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর ঘাটের বাঁ পাশে ভাঙিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি আকন্দগাছের তলা খুঁড়িয়া বাহির করিল একটি ঘটি। সেটিকে লইয়া সে নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

থানা-পুলিসের সংবাদটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। দফাদারটা দিন দুই হইল গান শুনিবার ছলে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া গেল।

গতরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে গিয়া হারাণের নজরে পড়িল দুইটি মানুষ।

সে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

উত্তর হইল, আমরাই গো।

আচার্য আবার প্রশ্ন করিল, আমরাই কে হে বাপু?

আমি রামহরি দফাদার আর সঙ্গে থানার মহুরীবাবু! রোঁদে বেরিয়েছি।

সকালে উঠিয়া রাগিণী আলাপ তেমন জমিল না। তমোরীশ বসিয়া আছে; প্রথম দিন হইতেই যন্ত্র-ঝংকার উঠিলেই সে আসিয়া বসে। নিশিও নিয়মিত আসিয়াছিল। গান শেষ করিয়া আচার্য নীরবে তামাক টানিতেছিল।

হৈম আসিয়া দাঁড়াইল। সে বোধ হয় দাদার নিকট হইতে প্রথম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সেই প্রথমে ডাকিল, দাদা!

আচার্য মুখ তুলিয়া চাহিল।

আজ তমোরীশকে ইস্কুলে ভরতি ক'রে দিয়ে আসবে দাদা?

হারাণ বলিল, উঁহু, আজ দিন ভাল নয়।

হৈম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, কাকে কি বলছ? আমিও যে দৈবজ্ঞের ঘরের মেয়ে দাদা। দিন ভাল মন্দ—

সপ্রতিভ ভাবে হারাণ বাধা দিয়া বলিল, না, মানে—পয়সা নেই হাতে আজ। আর ভাল দিন তো আরও আছে।

ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৈম কহিল, তাই হবে। কিন্তু বই কখানা কিনে দাও।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল, দেব।

হৈম চলিয়া গেল।

যন্ত্রগুলায় আবরণ পরাইতে পরাইতে আচার্য কহিল, তমোরীশ, ভেতরে যাও তো বাবা।

বালকের বিলীয়মান পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিয়া হারাণ মৃদুস্বরে নিশিকে কহিল, আমার বাড়িটা তুই কিনবি নিশি? যা হয় দাম দিস তুই। পুলিস বড্ড আমার পিছনে লেগেছে।

নিশি চমকিয়া উঠিল। আচার্য বলিল, ভবী মিশ্রকে দিলে দুশো টাকা সে এখুনি নেয়। কিন্তু লোকটা পুলিসের গুপ্তচর —ঠিক ব'লে দেবে। তুই নে, এক শো টাকা তুই আমাকে দিস—না—এক শো পাঁচ।

নিশি কহিল, দিদিঠাকরুণ, তমোরীশ—এরা কোথা যাবে?

হারাণ আর কথা কহিল না।

পরদিন সকালবেলা আর হারাণের সেতার বাজিল না। নিশি

আসিয়া ফিরিয়া গেল। তমোরীশ আবিষ্কার করিল মামার যন্ত্রগুলির মধ্যে তানপুরাটা নাই।

সন্ধ্যায় নিশি আসিয়া দেখিল, হৈম বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পাশেই ম্লানমুখে কয়খানি নূতন বই হাতে তমোরীশ বসিয়া ছিল। নিশি শুনিল, হারাণ ভবী মিশ্রকে পঁচানব্বই টাকায় বাড়ি বেচিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় কয়খানি বই তমোরীশকে দিবার জন্য দিয়া গিয়াছে।

আচার্য কিন্তু কাশী যায় নাই। সে বর্ধমান জেলা পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পড়িল। নিতান্ত পথে পথে যাত্রা। কাঁধে এক কম্বল, একটি পুঁটলি, হাতে তানপুরা।

একখানা গ্রামে প্রকাণ্ড দালান ঠাকুরবাড়ি দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

মুর্শিদাবাদ আমিরী চালের জন্মভূমি; বনিয়াদী চাল—পুরানো বন্দোবস্ত আজও এখানে নিঃশেষ হয় নাই। এ বাড়ির বন্দোবস্তও পুরানো। অতিথিকে এখানে মানুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় না, দেবতার প্রসাদ কামনা করিয়া দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়।

অপরাহ্নবেলায় নজরে পড়িল, বনিয়াদী চালের অভাব এখনও সেখানে নাই।

ঠাকুরবাড়ির পাশেই বাবুদের বৈঠকখানায় বড় হলে আসর পড়িতেছে, ঝাড়ে দেওয়ালগিরিতে বাতি বসানো হইতেছে।

হারাণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ছিলম্চী-খানসামার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকাণ্ড বড় ছিলম্দানিটা কলিকায় কলিকায় ভরিয়া গিয়াছে।

খানসামা বলিল, বড় সেতারী এসেছেন, মজলিস বসবে আজ।

হারাণ কহিল, আমাকে শুনবার একটু সুবিধে ক'রে দিতে হবে ভাই। তানপুরাটা সে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিল। সেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া খানসামা কহিল, আপনিও কি ওস্তাদ নাকি?

আচার্য বলিল, গান-পাগলা মানুষ দাদা। ওস্তাদ-টোস্তাদ কিছু নই।

মজলিসে স্থান সে পাইল।

দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া পড়িয়া ছিল। সোনা-রূপার সাত-আটটা গড়গড়া পড়িয়া আছে। রূপার পরাতে প্রচুর পানের খিলি, আতরদানে আতর ও তুলা শোভা পাইতেছিল। দুই-তিনটা গোলাপপাশ হইতে গোলাপ-জল ছিটানো হইতেছিল। প্রকাণ্ড চারিটা হাতপাখা লইয়া চারিজন খানসামা চারি কোণে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল।

সুগন্ধি ধূপ ঘরের চারিদিকে জ্বলিতেছে। ফরাসের এক কোণে সে বসিল। প্রথমেই বিতরণ করা হইল পান ও আতর। সম্মানী-সম্ভ্রমী ব্যক্তিদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইল। তারপর আরম্ভ হইল সঙ্গীত। ওস্তাদের সুনিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সেতার সত্য সত্যই গান গাহিয়া উঠিল। জোয়ারীর তারগুলির ঝংকারে মানুষ, আলো, এমন কি ঘরখানার সব উপাদান পর্যন্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেল। ঘরের জানালার গরাদেতে হারাণ হাত দিয়া ছিল, সে অনুভব করিল, লোহার গরাদের মধ্যেও সে ঝংকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের গতি দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, দুনে বাজনা চলিল। আঙুলের ছোঁয়ায় তারের মধ্য হইতে সুরের ফুলঝুরি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মধ্যপথেই কিন্তু সঙ্গীত শেষ করিতে হইল। যন্ত্রী তবলচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপ্‌কো হাঁত আর নেহি চলেগা।

বাদক লজ্জিত হইয়া বলিল, আমার শিক্ষা সামান্যই।

অবসর পাইয়া খানসামা শরবত ধরিয়া দিয়া গেল। ফুরসী-গড়গড়ার ডাকে মজলিসটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধুতুরা ফুলের মত লম্বা একটি রূপার কলিকা আসিল ওস্তাদের জন্য। ওস্তাদের হাত হইতে কলিকাটা ঘুরিয়া বেড়াইল।

ওস্তাদজী আবার সেতার তুলিয়া কহিলেন, আওর কোই হ্যায় সংগত করনেকো লিয়ে ?

মালিক মনোহর সিংহ চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে লজ্জিত-ভাবেই বলিলেন, দুস্‌রা আদমী তো কোই নেহি হ্যায়।

হারাণ উঠিয়া পড়িল। আভূমিনত এক নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিল, হুজুর, হুকুম হয় যদি, তবে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

গৃহস্বামী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন, পারবে তুমি ?

ওস্তাদ কহিলেন, আইয়ে—বয়ঠিয়ে।

একজন বলিয়া উঠিল, পাগল নয় তো ?

ওস্তাদ কহিলেন, কোকিল বনমে রহে বাবুজী—রঙভি কালা উস্‌কা। লেকেন গানেওলাকে বাদশা ওহি।

গৃহস্বামী আতর-পানে মান্য করিয়া হারাণকে সংগত করিতে অনুমতি দিলেন। সংগত আরম্ভ হইল।

আচার্যের হাতে চর্মবাদ্য সেতারের সুরে সুর মিশাইল। অপূর্ব সমন্বয়ে সুসঙ্গতরূপে সংগত শেষ হইল। ওস্তাদ যন্ত্রখানি পাশে রাখিয়া তারিফ করিয়া উঠিলেন, বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ মিঠা হাঁত আপ্‌কা।

মালিক একগাছি মালা আচার্যের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, ওস্তাদজীর কোথায় বাড়ি ? কি নাম আপনার ?

জোড়হাত করিয়া হারাণ কহিল, হুজুর, আমি ভবঘুরে। গান-বাজনা ক'রেই বেড়াই। নাম আমার নারাণচন্দ্র রায়।

এ নামটা পথে পা দিবার সময়ই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সেতার সংগতের শেষে ওস্তাদের অনুরোধে হারাণ গানও গাহিল।

মনোহরবাবুর আশ্রয়েই হারাণ আচার্য থাকিয়া গেল। এমনই একটি আশ্রয়ই যেন সে খুঁজিতেছিল। জীবনের চারিদিকে বিলাসের আরামে তাহার যেন ঘুম আসিল। কর্মের দায়িত্ব নাই, শুধু বাবুর মনস্তুষ্টি করিলেই হইল। বাবু ঘামিলে সে বাতাস করে, অকারণে ছিলম্চী-খানসামাকে ধমক দিয়া নূতন কলিকা দিতে আদেশ দেয়। মনোহরবাবু শিকারে যান, সঙ্গে হারাণ থাকে। সে অবিকল তিতিরের ডাক ডাকে, বনমধ্য হইতে তিতির সাড়া দিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সেতার শোনায়, গান গায়, পাখির মাংস রাঁধিয়া দেয়। রান্নাতেও হারাণের হাত বড় মিঠা। যায় না সে শুধু বাঘ শিকারের সময়। জোড়হাত করিয়া বলে, আজ্ঞে, আমার কত্তাবাবাকে

বাঘে ধ'রে খেয়েছে। জ্যান্ত বাঘ দেখা আমাদের বংশে নিষেধ আছে।

মনোহরবাবুর জীবনে সে অপরিহার্য হইয়া উঠিল। নারাণ রায় ভিন্ন একদণ্ড তাঁহার চলে না। নারাণের জীবনও বড় সুখেই কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সে কেমন হইয়া উঠে। বার বার ঠাকুরবাড়িতে যায়, চারিদিকে চায়, পাথরের মন্দিরের প্রতি পাথরটি যেন মনে আঁকিয়া লয়। দ্বারের সশস্ত্র প্রহরীটাকে দেখিয়া অকারণে শিহরিয়া উঠে।

সেবার শিকারের পর্বটা প্রবলভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল। খাঁটি আমিরী চালে সমস্ত চলিতেছে। বন্ধু, সঙ্গীত, হাতিয়ার, হাতী—কিছুরই অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে গানের আসর বসে।

ক্রমশ কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। ঘুমে সব অচেতন। হারাণ উঠিয়া তাঁবুর দরজার পর্দাটা টানিয়া দিল। তারপর মনোহরবাবুর পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরবাবুর নাক ডাকিতেছিল। ব্যজনের আরামে সে ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিল। পাখাখানি রাখিয়া হারাণ তাঁহার বুকে হাত দিল। মোটা সোনার চেনটা সে খুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বিড়বিড়

করিয়া কি বকিতে বকিতে মনোহরবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হারাণের বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল।

মনোহরবাবু উঠিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন, এগুলো রাখ তো রায়জী। এই ঘড়ি চেন বোতাম—বুকে লাগছে আমার।

হারাণের সর্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, নাও না হে খুলে।

হারাণ তাঁবুর দুয়ারের দিকে তাকাইল। জাগ্রত প্রহরীর পদশব্দের বিরাম নাই। জিনিসগুলি হাতের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া সে নির্বাকভাবে বসিয়া রহিল। প্রভাতে মনোহরবাবু উঠিতেই সে দুই হাতে জিনিসগুলি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ওগুলো তোমার বকশিশ রায়জী। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে বলতে ভুলে গিয়েছি।

হারাণ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনোহরবাবু বলিলেন, গুণী লোক তুমি রায়জী, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি দেওয়া উচিত। কিন্তু সিংহবংশের আর সেদিন তো নেই।

হারাণ ধীরে ধীরে কহিল, আমাকে কি বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন বাবু?

হাসিয়া মনোহরবাবু বলিলেন, বামুনজাত কিনা, দক্ষিণে পেলেই

ভাবে, বিদেয় ক'রে দিল বুঝি। যাও—ব'লে দাও দেখি, খেয়ে দেয়েই তাঁবু ভাঙতে হবে। আজই উঠতে হবে।

গজভুক্তকপিত্থের মত সিংহবাড়ির অন্তঃসার বহুদিন হইতেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সেদিন একটা বড় মহালের নায়েব সংবাদ লইয়া আসিল—বৎসর বৎসর নিয়মিতরূপে রাজস্ব না পাইয়া জমিদার বড় রুষ্ট হইয়াছেন, অষ্টম নালিশ দায়ের করিয়াছেন। মহালের টাকা ইতিপূর্বেই আদায় হইয়া সদরে আসিয়াছে। সুতরাং এখন সদর হইতে টাকা দিয়া মহাল রক্ষা করিতে হইবে।

মনোহরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদানন্দময় মুখে তাঁহার চিন্তার ঘন বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

সদর-নায়েবকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, ওপারের কেঁয়ে-বেটার কাছে একবার দেখে আসুন তা হ'লে। দশ হাজার টাকা হ'লেই তো হবে!

নায়েব নতমুখে বসিয়া রহিল। বাবু বলিলেন, কালই যান তা হ'লে। কি বলেন?

ধীরে ধীরে নায়েব কহিল, লোকটা বড় পাজী। যা তা বলে। ওর কাছে টাকাও নেওয়া হ'ল অনেক।

মনোহরবাবু শুধু কহিলেন, হুঁ।

তারপর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, থাক্ তা হ'লে।

নায়েব প্রশ্ন করিল, কিন্তু অষ্টমের কি হবে?

যাবে, কি করব, উপায় কি?

অন্য কোথাও দেখব চেষ্টা ক'রে?

দেখুন। কিন্তু—। সজাগ হইয়া তিনি নল টানিতে আরম্ভ করিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মজলিস বসিল। মনোহরবাবু হুকুম করিলেন, আজ করুণ রসের গান তুমি শোনাও রায়জী। মন যাতে উদাস হয়, চোখে জল আসে।

রাত্রে মজলিস ভাঙিল। পারিষদের দল চলিয়া গেল। বাবু বাড়ির মধ্যে যাইবার জন্য উঠিলেন। হারাণ জোড়হাত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মনোহরবাবু হাসিয়া বলিলেন, রায়জী?

একটা নিবেদন আছে হুজুর।

কি, বল।

একটু নির্জন—

মনোহরবাবু আলোক-ধারী খানসামাটাকে চলিয়া যাইতে

আদেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হারাণ কহিল, হুজুর, অভয় দিতে হবে আগে।

কি ভয় তোমার? বল, তুমি বল।

গরিব ভিক্ষুক আমি হুজুর, আপনার অন্নে বেঁচে আছি আমি। হুজুর, আমার—আমার—

মনোহরবাবু বলিলেন, বল, ভয় কি?

হারাণের জিভটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, সে কহিল, আমার কিছু টাকা আছে হুজুর—হাজার দশেক হবে বোধ হয়। হুজুরের দরকারে লাগে—

মনোহরবাবু স্থির দৃষ্টিতে হারাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারাণ বলিল, পরে আবার আমাকে দেবেন হুজুর।

মনোহরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন, রায়!

তারপর আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। আলোকের কথা তাঁহার আজ খেয়ালই হইল না।

হারাণের চোখ দিয়া জল আসিল। বাবুর নীরব ধন্যবাদের ভাষা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। চাকরটাকে আলো লইয়া বাবুর সঙ্গে যাইতে বলিয়া দিয়া গুনগুন স্বরে সে ধরিল একখানি বেহাগ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে হারাণ উঠিয়া চলিল পতিত আবর্জনাভরা একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া। নির্দিষ্ট একটা স্থান খুঁড়িয়া বাহির করিল ধাতুময় পাত্র একটা। তাহার মুখাবরণ খুলিয়া হারাণ বাহির করিল, সোনার বাট একখানি। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ঝক্‌ঝক করিতেছিল। সেখানা রাখিয়া তুলিল আর একখানি। সেও তেমনই উজ্জ্বল। ওগুলি ছাড়া আরও দুইটি বস্তু ঝক্‌ঝক করিতেছিল—সে তাহার নিজের চোখ।

সকালে উঠিয়া কিন্তু হারাণকে আর পাওয়া গেল না। তাহার তানপুরাটাও নাই।

মনোহরবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, সে চ'লে গিয়েছে। আর আসবে না।

হারাণ এবার আসিয়া উঠিল কাশী।

ভাগ্যগুণে অবিলম্বে আশ্রয়ও একটু জুটিয়া গেল। পথেই সে গিরিমাটিতে কাপড় ছোপাইয়া লইয়াছিল। গেরুয়ার উপর তানপুরা দেখিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিল, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া ডাকিয়া তাহাকে একটা মঠে আশ্রয়ও দিল।

চারিদিকে ধর্মের সমারোহ। সেই সমারোহের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হারাণ যেন ডুবিয়া গেল। সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মন যেন তাহার পবিত্র হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি শিবনামের কলরোলের মধ্যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যায় যোগীরাজের স্তব করে সে ধ্রুপদ-ধামারের মধ্য দিয়া। তাহার আচারে ব্যবহারে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল যেন। ইতর রসিকতা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন লজ্জা করে। সংযত মৃদুভাবে সে কথা কয়।

এদিকে অল্পদিনের মধ্যে গানের জন্য তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা মঠ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল। সাধু-সন্ন্যাসীরা গানে মুগ্ধ হইয়া সাদরে কোল দিয়া বলেন, বিশ্বনাথকো কৃপা আপ্‌কো পর হো গিয়া।

হারাণের চক্ষে জল আসে। সে জোর করিয়া তাঁহাদের পায়ের ধূলি লইয়া বলে, আশিস্ করিয়ে মহারাজ।

কিন্তু দুইটি মানুষের মুখ অহরহ তাহাকে পীড়া দেয়। তমোরীশের অসহায় কচি মুখখানি মনে পড়ে,—যখনই অনুদিত প্রাতে উষার আলোয় সে সেতার লইয়া বসে, তখনই মনে হয় তমোরীশ কুরঙ্গ-শিশুর মত নীরবে মুগ্ধ চক্ষু দুইটি মেলিয়া গান শুনিতেছে। আর মনে পড়ে মনোহরবাবুর সেই

সদানন্দময় মুখ। তাঁহার সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠের দুইটি কথা 'রায়', তাঁহার সেই ছলছল চোখ—সব মনে পড়ে।

তবু সে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে, তাহার অন্তরে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে।

মঠের ফটকে বসিয়া ভিক্ষা করে এক অন্ধ। পদশব্দ শুনিলেই সে চিৎকার করে, অন্ধকে দয়া কর বাবা। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা। হারাণের পদশব্দেও সে ভিক্ষা চায়।

হারাণ হাসিয়া বলে, আমি রে বাবা।

ভক্তিভরে অন্ধ কহে, সাধুবাবা, প্রণাম বাবা।

হারাণ আশীর্বাদ করে।

এক এক দিন আক্ষেপ করিয়া অন্ধ বলে, আজ আর কেউ কিছু দিলে না বাবা।

কিছু পাও নি? একটু চিন্তা করিয়া হারাণ সেইখানে দাঁড়াইয়াই গান ধরিয়া দেয়। চারি পাশে মুগ্ধ পথিকের দল ভিড় জমাইয়া দাঁড়ায়। গান শেষ করিয়া হারাণ সকলকে অনুরোধ করে, এই অন্ধকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে যান দয়া ক'রে।

পয়সা পড়িতে থাকে। ভিড় ভাঙিয়া গেলে হাত বুলাইয়া পয়সাগুলি তুলিতে তুলিতে অন্ধ কৃতজ্ঞতাভরে বলে, বাবা—সাধুবাবা!

হারাণ অন্যমনস্কভাবে অন্ধের দিকে চাহিয়া থাকে ; তারপর অকস্মাৎ দ্রুতপদে সে চলিয়া যায়।

অন্ধটা রাত্রে মঠের মধ্যেই এক পাশে পড়িয়া থাকে। ছেঁড়া একটা কম্বল ও চামড়ার একটি বালিশ তাহার সম্বল।

সেদিন অন্ধটা বলিল, সাধুবাবা!

কি রে?

আমার একটি কাজ ক'রে দেবে বাবা?

কি?

একটু ইতস্তত করিয়া অন্ধ বলিল, কাল বলব।

পরদিন চলিয়া গেল। অন্ধও কিছু বলিল না, হারাণেরও সে কথা মনে ছিল না। তাহার পরদিন, অন্ধ আবার কহিল, আমার কথা শুনলে না সাধুবাবা?

হারাণ হাসিয়া বলিল, কই, তুমিও তো কিছু বললে না।

অন্ধ বলিল, আজ বলব।

বল।

অন্ধ প্রশ্ন করিল, কে রয়েছে বাবা এখানে?

চারিদিক দেখিয়া হারাণ কহিল, কই, কেউ তো নাই।

অতি মৃদুস্বরে অন্ধ বলিল, আমায় কিছু সোনা কিনে দেবে বাবা?

হারাণ চমকিয়া উঠিল।

চামড়ার বালিশটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্ধ কহিল, তামা রূপো বড় ভারী হয় বাবা। আগে কবার এক সাধু আমায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু শেষকালে—

সে চুপ করিয়া গেল। হারাণের হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অন্ধ বলিল, তার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বাবা।

চামড়ার বালিশটা ওপাশে সরাইয়া কনুইয়ের চাপ দিয়া সে বসিল, কহিল, সাধুবাবা!

হুঁ।

এনে দেবে বাবা?

হারাণ কহিল, দেব। কাল দেব।

পরদিন প্রাতে অন্ধটার কাতর ক্রন্দনে মঠের মধ্যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহার সেই চামড়ার বালিশটা খোয়া গিয়াছে। সেই বালিশটির মধ্যেই তাহার জীবনের সঞ্চয় সঞ্চিত ছিল—কয়খান সোনার বাট, কিছু টাকা, কিছু পয়সা।

অন্ধ বার বার বলিতেছিল, সেই চোর সাধু—সেই বদমাস—

দীনতা ও হীনতার তাড়নায় গালাগালির অশ্লীলতায় স্থানটাকে কদর্য করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, পাথরের চত্বরে

মাথা কুটিয়া নিজের অঙ্গ ও পবিত্র দেবভূমি রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

ইহার মাস চারেক পরে মনোহরবাবু একখানা পত্র পাইলেন। বর্ধমান হাসপাতাল হইতে রায়জী পত্র লিখিয়াছে—

> মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ দুই মাস হইল অজীর্ণরোগে ভুগিয়া হাসপাতালে মরিতে আসিয়াছি। একবার দয়া করিয়া আসিবেন। ইতি—
>
> আশ্রিত—নারায়ণচন্দ্র রায়

পরিশেষে হাসপাতালের চিকিৎসক জানাইয়াছেন, আসিলে সত্বর আসিবেন। এক সপ্তাহের অধিক রোগীর জীবনের আশা করা যায় না।

মনোহরবাবু রায়ের এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার পরদিনই বর্ধমান যাত্রা করিলেন। অপরাহ্ন-বেলায় তিনি হাসপাতালে হারাণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, রায়জী!

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হারাণ পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল।

বাবুকে দেখিয়া ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাবু কহিলেন, ভয় কি ? ভাল হয়ে যাবে তোমার অসুখ।

বহুক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া হারাণ কহিল, আর না ; বাঁচবার কথা আর বলবেন না। আমার জীবন যাওয়াই ভাল।

মনোহরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া মিনতিভরে হারাণ বলিল, আমাকে মাপ করুন বাবু।

অম্লান হাসি হাসিয়া বাবু কহিলেন, সে কথা আমি কোনদিন মনে করি নি রায়জী। তা ছাড়া তোমার আশীর্বাদে সম্পত্তি আমার রক্ষা হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হারাণ বলিল, আরও অপরাধ আমার আছে। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি। আমি পাপী। আমার নাম নারাণ রায় নয়—

বাধা দিয়া মনোহরবাবু কহিলেন, জানি, তোমার নাম হারাণ আচার্য। সে থাক্।

কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল। বাবু কহিলেন, একটা কথা বলব রায়জী ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে হারাণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনোহরবাবু বলিলেন, পাপের ধনটা দিয়ে একটা ভাল কাজ তুমি ক'রে যাও যাবার সময়।

দুই হাতে বাবুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে হারাণ বলিল, উদ্ধার করুন বাবু, আমায় উদ্ধার করুন। ওগুলো যেন বুকে চেপে ব'সে আছে আমার, প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।

বাবু কহিলেন, হাসপাতালেই টাকাগুলো তুমি দিয়ে যাও। এই হাসপাতালেই দিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হারাণ সংযতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, বর্ধমান স্টেশনের ধারেই একটা ছোট বাড়ি শেষে করেছিলাম। সেই ঘরের মেঝেতে—

সে নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার কহিল, এবার কটা বাঘ মারলেন ?

আরও কয়টা কথা কহিয়া বাবু উঠিলেন, বলিলেন, কাল আবার আসব।

আরও একখানা পত্র গিয়াছিল তমোরীশের নামে। হৈম তমোরীশকে লইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পরই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম কাঁদিয়া কহিল, অসুখ হ'লে আমার কাছে গেলে না কেন ?

তমোরীশকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়

দেখিতে দেখিতে দুইটি জলের ধারা তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পর কহিল, তমোরীশ, আমার টাকা আছে তোকে ব'লে যাই।

হৈম বলিল, না দাদা, ব্যস্ত হ'য়ো না। ভাল হয়ে ওঠ আগে।

হৈমর মুখের দিকে হারাণ চাহিয়া রহিল।

ঔষধ দিবার সময় হইয়াছিল। একজন নার্স আসিয়া ঔষধ দিতে গিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আবার সে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা দেখিয়া একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়া ডাক্তার কহিলেন, তোমার যদি কোনও কথা বলবার থাকে কাউকে, তবে ব'লে রাখাই ভাল।

হৈম কহিল, দাদা!

মুখের দিকে চাহিয়া হারাণ বলিল, নিশি কেমন আছে হৈম?

হৈম সে প্রশ্ন গ্রাহ্য করিল না, কহিল, তমোরীশকে কি বলবে বলছিলে দাদা?

পাশ ফিরিয়া শুইয়া হারাণ কহিল, কাল—কাল বলব। ঠিক বলব।

সেই রাত্রেই হারাণ মারা গেল। হৈম তমোরীশ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোটা ঘরখানা খুঁজিয়া, দেওয়াল ভাঙিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহরবাবু একটি সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল—ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।

খাজাঞ্চিবাবু

মানভূম জেলায় ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানার একটা মেস। খাপরায় ছাওয়া একটানা লম্বা ব্যারাকের ধরনের একখানা বাংলো, সামনে সারি সারি থামওয়ালা একফালি টানা বারান্দা —সেই বারান্দার উপর বসিয়া কর্মচারীরা সকলে আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শীতকালের প্রাতঃকাল, সাড়ে ছয়টায় কারখানার ভোঁ বাজে। অশ্বিনী চা খায় না, সে গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছিল; ভিখারী আউটডোরে কাজ করে, সে নীল রঙের প্যাণ্টটা পরিয়া মোজা জোড়াটা খুঁজিতেছিল; তরুণ বদি রোজ পঁচিশটা ডন ফেলে, সে একাদশ ডনটি ফেলিতেছিল; বুড়া শশী মিস্ত্রী গত রাত্রের উদ্বৃত্ত মাংসের চর্বিগুলা গিলিতেছিল। ঠিক এই সময়েই কারখানার ভোঁ বাজিয়া উঠিল—ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ।

শেষ সিটিই তো বটে, থামিয়া থামিয়া বাজিতেছে। যে যেমন অবস্থায় ছিল, ছুটিল। ম্যানেজার নূতন লোক, সাহেবী মেজাজ; তাঁহার নূতন বন্দোবস্তে নিয়ম হইয়াছে, সাড়ে ছয়টার সিটি বাজিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলকে আপিসে আসিয়া হাজিরা-বই সহি করিতে হইবে। তাহার অধিক এক মিনিটও

বিলম্ব হইলে অর্ধেক দিন অনুপস্থিত লেখা হইবে। বদি একাদশ ডনটাতে ব্যায়াম শেষ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, স্লেভারি, ওঃ! সে তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আপিসে আসিয়া সে দেখিল, সেখানে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার খাজাঞ্চিকে বলিতেছে, হু আর ইউ? তুমি কে? হোয়াট রাইট—কে তোমাকে সিটি দেবার হুকুম দিতে রাইট দিয়েছে? হু আর ইউ?

বদি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে, অর্থাৎ প্রায় দশ মিনিট পূর্বে সিটি দেওয়া হইয়াছে। রক্ত যেন তাহার মাথায় চড়িয়া গেল, সে ঘুষি পাকাইয়া খাজাঞ্চির নাকের কাছে আসিয়া বলিল, ইয়ে কোথাকার!

কি হয়েছে আপনাদের?—নূতন ম্যানেজার সাহেবের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ হইয়া গেল। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঈষৎ উৎসাহের সহিত বলিল, সার্, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি প'ড়ে আছে, গাড়ি লোডিং শেষ হয় নি, দশ নম্বর কিলেন—

বাধা দিয়া ম্যানেজার বলিলেন, সে হিসেব আমি চাই নি। আমি জানতে চাই, এ গোলমাল কিসের জন্যে ?

খাজাঞ্চি হতবাক হইয়া গেল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সার্ভেয়ার সকলের মধ্যে পদস্থ ব্যক্তি, সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, সার্, কাল থেকে আপনি অর্ডার দিয়েছেন, সকাল সাড়ে ছটায় কাজ আরম্ভ হবে, আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হ'লে হাফ-ডে'জ ওয়ার্ক কাটা যাবে। শীত-কালের দিন সার, আর খাজাঞ্চিবাবু এসে ছটা কুড়ি মিনিটে—মানে দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন। আমাদের কারও খাওয়া হয় নি সার্, মুখের চা পর্যন্ত ফেলে এসেছি।

ম্যানেজার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে ছয়টার তখনও দুই মিনিট বিলম্ব আছে। নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে ঘড়িটাও ঠিক তাহাই বলিতেছে। ম্যানেজার বলিলেন, ওয়েল, আধ ঘণ্টা কাজ ক'রে আপনারা আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজ চালু ক'রে দিন। তারপর গিয়ে সব খেয়ে আসুন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনাদের আজ ছুটি থাকল। যান—যান সব।

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই আপিসটা পরিষ্কার হইয়া গেল। খাজাঞ্চি আপনার আসনে গিয়া বসিল।

ম্যানেজার বলিলেন, আপনি দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন ?

খাজাঞ্চি বলিল, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি আছে সার্, লোডিং শেষ হয় নি, দশ—

অসহিষ্ণুভাবে ম্যানেজার বলিলেন, সেসব আমি জানি, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তারই উত্তর দিন।

ফ্যালফ্যাল করিয়া ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া খাজাঞ্চি বলিল, হ্যাঁ সার্।

কেন ?" ঘণ্টা বা সিটি দিতে হুকুম দেওয়ার ভার তো আপনার ওপর নেই।

কাল থেকে অনেক কাজ বাকি প'ড়ে আছে সার্, লোডিং শেষ হয় নি, দশ নম্বর কিলেন—

আপনি কি কারখানার মালিক ?

না সার্।

আজ আপনাকে মাপ করলাম, কিন্তু এমন যেন আর না হয়। ম্যানেজার গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। শীতের দিনেও খাজাঞ্চি ঘামিয়া উঠিয়াছিল। বেচারী কপালের ঘাম মুছিয়া আপনার কাজে মন দিল। ক্যাশবাক্সের উপর একটি প্রণাম করিয়া খাতা খুলিয়া বসিল।

খাজাঞ্চিবাবু, টাকাটা আমাকে জলদি দিয়ে দেন তো।—স্টোর-ডিপার্টমেণ্টের পিওন একখানা ভাউচার ফেলিয়া দিল। ম্যানেজারের সই-করা ভাউচার, এক শো দশ টাকা দিতে হইবে।

খাজাঞ্চি বলিল, এত টাকা কি হবে ?

খড় কিনতে হবে।

তা—দাঁড়াও বাপু, একবার শুধিয়ে আসি। ভাউচারখানি হাতে করিয়া খাজাঞ্চি ম্যানেজারের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ভয় হইতেছিল, সে ফিরিল। কিন্তু আবার ফিরিয়া গিয়া বাহির হইতে ডাকিল, সার্!

আসুন।

এই ভাউচারটার টাকা—

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, টাকা কি কম আছে ?

মাথা চুলকাইয়া খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে না, তবে—

তবে ? আজ কি কোনও বড় পেমেণ্ট আছে ?

আজ্ঞে না, দোব কি না তাই শুধোচ্ছি।

সবিস্ময়ে খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার বলিলেন,

মানে—হোয়াট ডু ইউ মীন? ভাউচারে যখন সই করেছি, তখনই তো আমি দিতে বলেছি।

একটা সেলাম করিয়া খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্যানেজার আন্দোলিত পর্দাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইডিয়ট।

বাক্স খুলিয়া টাকা গুনিয়া গাঁথিয়া পিওনকে দিয়া খাজাঞ্চি বলিল, সই কর।

পিওন সই করিয়া দিল। টাকা লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু খাজাঞ্চি বলিল, শোন শোন।

কি?

দাঁড়াও তো, আর একবার গুনে দেখি, ভুল হ'ল না তো!

আবার দেখিয়া শুনিয়া দিয়া খাজাঞ্চি খাতায় খরচ লিখিল, স্টোর-খাতে খরচ। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সার্!

আসুন। কি? কি বলছেন আবার?

আজ্ঞে, খড়ের টাকাটা দিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার অবাক হইয়া খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খাজাঞ্চি একটা সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বারোটার ভোঁ বাজিল। স্নানাহারের জন্য এখন দেড় ঘণ্টা ছুটি। মেসে আসিয়া খাজাঞ্চি আপনার নিয়মমত জুতা জোড়াটি ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে খুলিয়া রাখিল। তারপর গায়ের জামা খুলিয়া ঘটি ও গামছা হাতে বারান্দার তিন নম্বর থামের খাটালটিতে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিল। স্টোর-কীপার ওদিকে তেল মাখিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, বোদ্‌দা, নতুন সাহেব লোক কেমন ?

খাজাঞ্চির নামও বদিবাবু। খাজাঞ্চি উত্তর দিল, ভাল লোক, পাকা লোক। চিঠি যা আজ লিখছিল খসখস ক'রে, জলে—র মত কলম চলছে যেন।

বালতি ও ঘটি হাতে খাজাঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইল। লম্বা বারান্দাটায় জল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে একটি করিয়া লোহার জালা রক্ষিত ছিল, খাজাঞ্চি প্রত্যেক জালা হইতে তুই ঘটি করিয়া জল তুলিয়া নিজের বালতিটি ভরতি করিয়া লইল। তারপর সম্মুখের প'ড়ো জমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাথরটায় স্নান করিতে বসিল।

ও-পাশে ম্যানেজার সাহেব তখন ঘর দেখিতে ঢুকিলেন। সমস্ত ঘর মেরামত ও চুনকাম করা হইবে, তাহারই ব্যবস্থা

করিতেছিলেন। খাজাঞ্চি স্নান সারিয়া আসিয়া ঢুকিল—জয়, জয় মা কালীঘাটের। সে গামছা পরিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। ঘরে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া। ম্যানেজার বলিলেন, আপনি এ ঘরে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ সার্, আর গোবিন্দ থাকে।

কিন্তু এ কি রকম ভাবে সীট সাজিয়েছেন—একটা উত্তর-দক্ষিণে, একটা পূর্ব-পশ্চিমে? এই, এই খালাসী, এই সীটটা ঘুরিয়ে দে তো—এইটাকে উত্তর-দক্ষিণে ক'রে দে। এ কি, ঘরের মাঝখানে জুতো?—বলিয়া তিনি নিজেই পায়ে করিয়া জুতা-জোড়াটা এক পাশে ঠেলিয়া দিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকজন সহ ম্যানেজার বাহির হইয়া গেলেন। খাজাঞ্চির সীটটাই ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি সেই গামছা পরিয়াই বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার তখন শশী মিস্ত্রীর ঘরে তামাকের গুল ও দেওয়ালে হাত-মোছা তেল-কালি ও মাংসের হলুদের দাগ লইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্যাণ্টের পিছনে পর্যন্ত হলুদ ও কালির দাগ।

সার্!

ম্যানেজার ফিরিয়া দেখিলেন, খাজাঞ্চি। বলিলেন, কি বলছেন?

কাপড় ছাড়েন নি এখনও আপনি? যান যান, কাপড় ছেড়ে আসুন।

সার্, আজ চোদ্দ বছর আমার সীটটা এমনই ভাবে আছে সার্। ম্যানেজার অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন, কি বলছেন আপনি?

আমার সীটটা—

হঠাৎ রুষ্ট হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, না না, আপনার জন্যে অন্যের অসুবিধা হতে পারে না।

খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রুম-মেট গোবিন্দ স্নানান্তে চুল আঁচড়াইতেছিল, সে বলিল, কাপড় ছাড়ুন।

খাজাঞ্চি বলিল, একবার তক্তপোশটা ধর তো ভাই গোবিন্দ।

গোবিন্দ অত্যন্ত ভালমানুষ, সে বলিল, ম্যানেজারবাবু যে—

ততক্ষণে তক্তাপোশের এক প্রান্ত ধরিয়া খাজাঞ্চি বলিল, ওরে বাবা, এই কারখানায় এসে অবধি এই ঘরটাতে—এই তক্তায়—ওই পূর্ব-শিয়রে আমি আছি, ও আমি বদল করব না।

গোবিন্দ আর প্রতিবাদ করিল না। তক্তাপোশের অপর প্রান্তটা সে আসিয়া ধরিল।

তক্তাপোশটা যথাস্থানে ঘুরাইয়া পাতিয়াই খাজাঞ্চি সর্বাগ্রে

জুতা-জোড়াটি তুলিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিষম চটিয়া বলিল, নাঃ, এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা। আচ্ছা, হুঁকো কে নামিয়ে দিলে আমার?

গোবিন্দ বলিল, ম্যানেজারবাবু। আবার সন্ধেবেলায় এসেছিলেন। বিশেষ ক'রে ব'লে গেলেন, হুঁকো ওখানে রাখবেন না। তক্তপোশ ঘুরিয়েছেন ঘুরিয়েছেন, কিন্তু জানলায় হুঁকো আর ঘরের মাঝখানে জুতো—এ রাখা হবে না।

জুতা-জোড়াটা ঘরের মধ্যস্থলেই খুলিয়া রাখিয়া খাজাঞ্চি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তক্তাপোশটার উপর বসিয়া পড়িল। আবার উঠিয়া সে জুতা-জোড়াটা সরাইয়া রাখিল।

পরদিন সকালবেলা। খাজাঞ্চি ঘড়ির কাছে চেয়ার লইয়া কি করিতেছিল। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ম্যানেজার নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

সেদিন অ্যাকাউন্ট্যান্ট অশ্বিনী ম্যানেজারকে খাতাপত্র দেখাইতেছিল। ক্যাশ-খাতা দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, এ কি? এ কি লেখা? আর লাইন আরম্ভ হয়েছে এখানে, শেষ হ'ল গিয়ে দু ইঞ্চি বেঁকে এসে এখানে? এ কি?

অশ্বিনী বলিল, খাজাঞ্চিবাবু চোখে ভাল দেখতে পান না, আবার চশমাও নেবেন না; বলেন, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

ম্যানেজার হাঁকিলেন, বেয়ারা! খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার বলিলেন, কত বয়স হ'ল আপনার?

ষাট সার্। এই কোম্পানিতেই চল্লিশ বছর চাকরি করছি, এ কারখানায় চোদ্দ বছর—গোড়া থেকেই, তখন এগুলো ডাঙা ছিল, মানুষ আসতে ভয়—

এতক্ষণে অসহিষ্ণু হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, থামুন, ও কথা নয়। আমি বলছি, এত বয়স হ'ল, চোখে দেখেন না, তবু চশমা নেন না কেন? এ কি—এ কি? এ রকম ভাবে কাজ চলবে না, মশায়।

নোব সার্, চশমা আমি নোব সার্।—খাজাঞ্চি চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বলিল, সার্, একবেলা যদি ছুটি দেন সার, আসানসোলে মোটর যাচ্ছে—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই ম্যানেজার বলিলেন, যান।

সন্ধ্যায় চশমা-চোখে খাজাঞ্চি প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিল, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। কেমন হ'ল

বল দেখি ? এক দুই তিন চার।—চালের বাতা গুনিতে আরম্ভ করিয়া দিল খাজাঞ্চি।

দিন কয়েক পর। ম্যানেজার খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিলেন, বড় দুঃখিত আমি খাজাঞ্চিবাবু, আপনার চাকরিতে জবাব হচ্ছে। মানে, কোম্পানি আপনাকে রিটায়ার করতে অনুরোধ ক'রে পত্র দিয়েছে। ইংরেজীতে অ্যাকাউন্ট রাখা হবে। আর ধরুন, আপনার চাকরিও হ'ল অনেক দিন, এখন নতুন লোককে জায়গা দিন। কেমন ? লোকও এসে গেছে আমাদের।—বলিয়া কোম্পানির চিঠি ও পদত্যাগ-পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, এই চিঠিখানায় সই ক'রে দিন। হ্যাঁ, কোম্পানি আপনাকে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়েছে।

খাজাঞ্চি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ম্যানেজার তাহার হাতে কলম তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এইখানটায় সই ক'রে দিন। হ্যাঁ, তারিখ দিন—তারিখ।

চার্জও দেওয়া হইয়া গেল। খাজাঞ্চি দেখাইয়া দিল, তিন হাজার বাইশ টাকা, একটি আধুলি, একটি দু-আনি, কাগজে মোড়া একটি পাই।

ম্যানেজার তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া বলিলেন, দুঃখ করবেন

না খাজাঞ্চিবাবু। ধরুন, বয়সও অনেক হ'ল আপনার। আর আপনার যে রকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।

খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—

কর্মচারীরা কিন্তু এত সহজে বিদায় দিল না। তাহারা সভা করিল, বিদায়-ভোজ দিল, গলায় মালা পরাইয়া দিল, অনেকের চোখে জলও দেখা দিল।

পরদিন ভোরে কয়টা খালাসী খাজাঞ্চিবাবুর মাল মাথায় করিয়া স্টেশনে চলিয়াছিল, পিছনে পিছনে খাজাঞ্চিবাবু, তাহার চোখে সেই নূতন চশমা। সহসা খাজাঞ্চি বলিল, কই রে, এখনও সিটি দিলে না আজ এরা?

খালাসী বলিল, এখনও তো সময় হয় নি বাবু, এই গাড়িটা যাবে, তবে তো!

খাজাঞ্চির মনে পড়িল, হাঁ, তাহাই তো বটে, সাড়ে ছয়টা তো এখনও বাজে নাই। সাড়ে ছয়টার ট্রেনেই তো সে যাইবে। খাজাঞ্চি একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কারখানার চিমনি হইতে গলগল করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান

হাসি হাসিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, ভগবান আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কোথায় আকাশ! চশমা-আবরিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখেও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদ্গীরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ডাক-হরকরা

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপর আকাশে দুর্যোগ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই, সাধারণ অন্ধকারের মধ্যে থাকে যে স্বল্প স্বচ্ছতা তাহাও নাই ; ঘন মেঘের কালো ছায়ায় প্রগাঢ় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। চারিপাশে শুধু অজস্র সঞ্চরমান জোনাকির দীপ্তি জ্বলে আর নেবে—জ্বলে আর নেবে, যেন অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিব্যাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ রাস্তার একটা কাদা-ভরা গর্তে গরুর গাড়িখানা পড়িয়া একটা ঝাঁকুনি খাইতেই ডাক্তারের চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল। চারি পাশে জল-ভরা মাঠে ব্যাঙের চিৎকার, আশেপাশে বৃক্ষ-পল্লবের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, তাহারই সঙ্গে গরুর গাড়িখানার চাকার বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুরের মত একটি সকরুণ দীর্ঘ শব্দ বেশ শোভনভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশের গাছগুলির পাতায় পাতায় জল ঝরিতেছে, টুপটাপ—টুপটাপ।

ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তার নুড়িপাথরের কঠিন বন্ধুতার উপর দিয়া গাড়িখানা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। দূরে যেন একটা জোনাকি অনির্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেটা এই দিকেই আসিতেছে।

ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি আলো অটল?

বর্ষার রাতে অটল ঘুমে ঢুলিতেছিল, সে একবার জোর করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিয়া বলিল, কে জানে মশায়! অঁই—অঁই—ই গরুকে কি বলতে হয় বল দেখি!—বলিয়া গরু দুইটিকে একবার তাড়না করিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

হাঁ, আলোই ওটা, ক্রমশ দীপ্তিটা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে। ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া কে এমন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে? রোগীর বাড়ির লোক নয়তো?

ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—মৃদু ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল, কে? কে? কে আসছে?

উত্তর আসিল, ডাক—সরকার-বাহাদুরের ডাক। ডাক-হরকরা আমি।—বলিতে বলিতে লোকটি নিকটে আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল—বেঁটে, কালো, আধা-বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেল-ব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছেঁড়া একটি মাথালি, এক হাতে একটি বল্লম ; ওই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে ঝুলানো ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল, কে রে—দীনু ?

দীনু ডোম ডাক-হরকরা—মেল-রানার, সাত মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোস্ট-আপিসে।

সচল দীনু উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতটা রাত্রি হ'ল বল্ দেখি দীনু ?

আজ্ঞে, তা—রাত ভেঙে এসেছে, তিন পহর গড়িয়ে এল আর।

দীনুর কথার শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ির পিছন দিক হইতে। মেল-রানার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোর শিখাটা ক্রমশ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অটল কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওই বস্তার ভিতরে কি থাকে?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, চিঠি রে, চিঠি।—কত দেশদেশান্তরের খবর, বুঝলি? এই একশো দুশো পাঁচশো ক্রোশ দূরে যা সব ঘটছে, সেই সব খবর ওই ব্যাগের মধ্যে থাকে।

অটল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, দেশদেশান্তরের খবর! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, সাধে বলে—বায়ের আগে বাত্তা ছোটে!

বায়ুরও আগে নাকি বার্তা ছুটিয়া চলে। ডাক্তার পিছনের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ওই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে ডাক-হরকরার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টার শব্দ আর শোনা যায় না, অসংখ্য খদ্যোদ্দীপ্তির মধ্যে ডাক-হরকরার আলোক জোনাকির আলোর মতই ক্ষুদ্র হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার অটলকে বলিল, বায়ের আগে বার্তা ছোটে—কথাটা বেশ অটল।

ডাক্তারের গাড়ি অন্ধকার পথ ধরিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

ডাক-হরকরা তাহার অভ্যস্ত নির্দিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল। হাতের হ্যারিকেনটার শিখা দ্রুত গমনের

জন্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধোঁয়ায় চিমনিটাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে। দীনুর হাতে বল্লমটা বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মাথায় মাথালিটা দড়ি দিয়া চিবুকে বাঁধা। ইহাতে শুধু মাথাই বাঁচিয়াছে, দীনুর সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে নামিল।

দীনু কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল, এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার উপায় নাই—হুকুম নাই। গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না। ডাকবাবু বলেন, এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে দীনু।

দীনুর বুকটা শঙ্কায় কেমন গুরগুর করিয়া উঠে। আবার একটু গৌরবও অনুভব করে।

তাহাদের পাড়ার নোটন ডোম চৌকিদারি কাজ করে, দীনু তাহাকে বলে, এ বাবা তোমাদের চৌকিদারি কাজ লয় যে, ঘরে শুয়েই জানলা থেকে দুটো হাঁক মেরেই খালাস, চাকরি হয়ে গেল! এ হ'ল সরকারী ডাকের কাজ, এক মিনিট দেরি হ'লেই—বাস্, হাতে হাতকড়া।

আজ সাত বৎসর দীনু ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে ; প্রত্যহ

রাত্রে সে ডাক লইয়া যায়, লইয়া আসে, কিন্তু কোন দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সেবার পুল ভাঙিয়া একদিন কলিকাতার ডাকগাড়ি আসে নাই, একদিন পথে মালগাড়ি ভাঙিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ি আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল, কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়, ঠিক সময়ে আসে।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশে মেঘ যেন জমাট অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে সে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অজগর-জিহ্বার মত বিদ্যুৎরেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া খেলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মেঘের গম্ভীর মৃদু গর্জন,—দূরে পুলের উপর ডাকগাড়ির শব্দের মত দীনুর মনে হয়। অকস্মাৎ একটা সুতীব্র নীল আলোকে দীনুর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কঠোর বজ্রধ্বনিতে সমস্ত যেন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য ত্রাসে বিহ্বল হইয়া দীনু বলিয়া উঠিল, রাম—রাম—রাম। দূরে কোথায় বাজ পড়িয়াছে। মুহূর্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দীনু আবার তাহার অভ্যস্ত গতিতে ছুটিয়া চলিল। বল্লমের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল, ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

ডাকঘরে যখন সে পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পুঞ্জিত মেঘস্তর পরিষ্কাররূপে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। ডাক নামাইয়া দীনু একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, উঃ, বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু, সাঙিন বাজ! বাপ রে, বাপ রে!

পোস্টমাস্টার বলিলেন, ওঃ, বিছানাতে থেকেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম দীনু। তারপর দীনুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এঃ, ভিজে গিয়েছিস যে রে—অ্যাঁ! দাঁড়া বাবা, ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রিগুলো দেখে নিয়ে তোর ছুটি ক'রে দিই, তুই বাড়ি গিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল্।

দীনু বলিল, তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি একবার। উঃ, বড্ড কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অতঃপর পোস্টমাস্টার ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রি লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপর খট্‌খট শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীনু আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল; কিন্তু উপায় নাই, ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

কই হে, কাগজখানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি!—ইহার মধ্যে, এই ভোরেই জনকয়েক লোক পোস্ট-আপিসের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালীবাবুর সংবাদ-পত্রের সংবাদের জন্য উৎকট নেশা, তিনি হাত বাড়াইয়া

দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর ছিল গোবিন্দ রায়। লোকটি স্কুলমাস্টার, তাহার নেশা যত ফ্রী-স্যাম্প্‌লের। 'বিনামূল্যে' দেখিলেই গোবিন্দ রায় সেখানে চিঠি লিখিয়া বসিবে। জার্মানি হইতে বিনামূল্যে সে তাহার কোষ্ঠি তৈয়ারি করাইয়া আনিয়াছে। সে প্রত্যহ আসে, পাছে তাহার স্যাম্প্‌ল গোলমাল করিয়া অন্য কেহ লইয়া যায়। আর আসিয়াছিল— আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠির জন্য কয়জন যুবক। প্রৌঢ় রামনাথ চাটুজ্জেও আজ আসিয়াছিল, দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ ; চাটুজ্জে উৎকণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানি চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ করে, এদিকে চাটুজ্জে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এ চিঠি তাহার নয়।

ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রির কাজ শেষ হইয়া গেল। দীনুর এবার ছুটি, সে বাড়ি চলিল। হাতে তাহার খান-দুই রঙিন খাম— কাহার ছেঁড়া চিঠির ফেলিয়া-দেওয়া খাম, সে কয়খানা সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, গরুটার ঘাস দিতে এত দেরি করিস কেন দীনু? একটু সকালে সকালে দিস।

ডাকবাবুর গরুর জন্য ঘাস দীনুকে দিতে হয়।

তাই আনব।—বলিয়া দীনু চলিয়া গেল।

পথে রামনাথ চাটুজ্জের বাড়িতে তখন মেয়েদের বুক-ফাটা কান্নার রোল উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্মচ্ছেদী বেদনাস্পর্শে এই প্রভাতেও শ্রাবণের আকাশ যেন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল। দীনু চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল, আহা!

বাড়িতে আসিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীর হাতে খাম দুইখানি দিয়া দীনু বলিল, কেমন খাম এনেছি, দেখ্ লক্ষ্মী! কেমন ছবি, আবার কেমন সুবাস উঠছে, দেখ্! বেলাত থেকে এসেছে চিঠি।

লক্ষ্মী খাম দুইখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল, চিঠি কি বাবা?

কালি দিয়ে কাগজে সব নেকা থাকে মা।

কি নেকা থাকে বাবা?

এই—তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি।

আর?

আর কি থাকে—দীনুর মনে সেটা যোগাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

মেয়ে আবার প্রশ্ন করিল, আর?

অকারণে বিরক্ত হইয়া দীনু এবার বলিল, জানি না, যা। আবার কি থাকবে?

লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, বাপের বিরক্তি দেখিয়া সে আর প্রশ্ন করিল না, খাম দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, নেতাই কোথা, মাঠে গিয়েছে?

নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল, জানি না বাপু, কাল সন্‌জেতে সেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। সারা রাত আখড়াতে ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দুবার আমি ডাকতে গেলাম তো, আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে রুক্ষস্বরে বলিল, লবাবের বেটা লবাব, হারামজাদা আমার রোজকারে খাবেন আর টেরি ফাটিয়ে লব্বাগি ক'রে বেড়াবেন! তাকে আমার ঘরে ঢুকতে দিও না ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

নিতাইয়ের মা বলিল, সে তুমি ব'লো বাপু, আমি লারব।

দীনু উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে আরও রুক্ষস্বরে বলিল, কেনে, লারবি কেনে, শুনি?

ব'লে, কে মার খাবে বাপু? ছেলের চোখ যেন লাল.কুঁচ, আর লাটাই-ঘোরা হয়ে ঘুরছেই।

দীনু চিৎকার করিয়া উঠিল, মারবে! সে হারামজাদা কত বড়

মরদের বেটা দেখে লোব আমি।—বলিয়া সে কোদাল এবং ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে ও ঝুড়ি লইয়া মাঠে যাইতে উঠিয়া পড়িল। স্ত্রী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, এই দেখ, নিজের করনটা একবার দেখ—খাওয়া নাই, কিছু নাই, মরদ চললেন রাগ ক'রে! খেয়ে যাও বলছি। সারা রাত দোড় দিয়ে হাঁটা—দীনু ফিরিল, বলিল, ট্যাঁক-ট্যাঁক করা তোর এক স্বভাব!

ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত দেহে মাথায় ঝুড়িতে এক বোঝা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে বাড়ি ফিঁরিল। মাঠে মাছগুলি সে ধরিয়াছে। বাড়ির বাহির হইতেই সে শুনিল, তাহার 'লবাবপুত্তুর' নিতাই বেশ জড়িতস্বরে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে—

হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো—
লোক মরিছে অসম্ভব।

মাছ পাইয়া দীনুর মেজাজ বেশ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছেলেকে কোন কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বেশ হাসিয়া বলিল, গানের ছিরি দেখ দেখি বেটার! তাই, একটা ভাল গান গা রে বাপু।—বলিয়া সে নিজেই আরম্ভ করিল—

ওরে আমার কালো মেয়ে ভোবন করেছে আলো।

নিতাই বলিয়া উঠিল, থাম, থাম বাপু, ষাঁড়ের মত আর চেঁচিও না তুমি। আমি গাই, শোন—

দীনু অত্যন্ত চটিয়া গেল, সে গান থামাইয়া বলিল, রাখ্‌ তোর গান। বলি—আমার কথার জবাব দে দেখি আগে। মাঠ যাস নাই কেনে, শুনি ?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধু—রো, মাঠ গিয়ে কি হবে ? মাঠ গিয়ে কে কবে বড়নোক হয়েছে, শুনি ?

দীনু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, এই একরাশ ধান বেচলে তবে তোর একটা টাকা! ধু—রো, মাঠ গিয়ে কি হবে ?

নিতাইয়ের মা বলিল, ওরে লবাবের বেটা লবাব, খুব যে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি—একটা পয়সা কখনও এনেছিস তুই ?

নিতাই ট্যাঁক খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল—যেন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সেটা। তারপর বলিল, ওই লে, ফের যদি টিকটিক করবি তো বুঝতে পারবি।

মা তাহার অবাক হইয়া গেল। দীনু কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলিল, তুই টাকা কোথায় পেলি রে নেতাই ?

হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তর দিল, রাজারা মানিক কোথা পায় ?

দীনু গম্ভীরতর স্বরে বলিল, হাসি-তামসা নয় নেতাই। বল্ তুই, টাকা কোথা পেলি ?

নিতাই বিরক্তিভরে উঠিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, মর্ তুই ওইখানে বকবক ক'রে, হ্যাঁ।

দীনু উঠিয়া পিছন পিছন দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিল, নেতাই, শোন্, শুনে যা, ফিরে আয় বলছি।

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আখড়ায় চলিয়াছে।

দীনু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। নিতাইয়ের ভাবগতিক তাহার বেশ ভাল লাগে না। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার ও বিড়ি-সিগারেটের প্রাচুর্য দেখিয়া দীনু সন্দেহ করিত স্ত্রীকে—সে-ই বোধ হয় নিতাইকে গোপনে পয়সা-কড়ি দিয়া থাকে। কিন্তু আজ পুরা একটা টাকা এমন তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দেওয়ায় দীনুর চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, শেষ পর্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

স্ত্রী বলিল, মুড়ি দিয়েছি, খাও। খেয়ে একটুকুন গড়াও, বিছানা ক'রে দিয়েছি। ঘাস আমি মাস্টারবাবুর বাড়িতে দিয়ে আসছি।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, নেতাই টাকা কোথা পেলে বল্ দেখি ?

স্ত্রী বলিল, ভ্যালা মানুষ তুমি বাপু! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে বসলে ? বেটাছেলে, কোথাও হয়তো পেয়েছে।

দীনু কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

অপরাহ্নে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। দীনু নিতাইয়ের আপাদমস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীনুর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা-জোয়ান হইয়াছে নিতাই! সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারি করিয়াছে! সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয়, ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীনু পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বলিল, এইবার তো জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এইবার একটা কাজে-কম্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে পড়্। লতুন ডাকঘর হচ্ছে আবার রামলগরে—এই ফাঁকে লেগে যা।

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ঢের লোক আছে তোর কাজ করবার। উ কাজ আমি লারব। বাবাঃ, সারা পথ ধুকুর-ধুকুর ক'রে ছোটা, উ কি মানুষে পারে ?

নিতাইয়ের মা বলিল, কেনে, তোর বাবা পারে, আর তুই পারবি না কেনে? তোর বাবা কি মানুষ লয় নাকি?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, উ একটা আস্ত ভূত। লইলে, হ্যাঁঃ—

দীনু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, লইলে কি?

যাও যাও, ব'কো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়নোক হয়ে যেতে তুমি কোন্ দিন।

তার মানে?

মানে আবার কি? বললাম, তুমি ভেবে দেখ কেনে।—বলিয়া নিতাই হাত-মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। দীনু নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রী বলিল, হতভাগা উ কি বললে বল দেখি?

দীনু সে কথার কোন উত্তর দিল না, তাহার আর সময় ছিল না, সে বল্লম পেটি মাথালি ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

ঝুনঝুন—ঠুনঠুন।

ডাক-হরকরা মৃদুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বরাবর সমানভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

পথে একদণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দীনু কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথাও ওভার্‌সিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোন গাছের ডালে বসিয়া ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই সে রিপোর্ট করিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে জরিমানার হুকুম আসিয়া পড়িবে।

দীনু একবার মাত্র জরিমানা দিয়াছে। গতি-শৈথিল্যের জন্যও নয়, পথে সে বিশ্রামও করে নাই, তবুও তাহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। তখন সে নূতন কাজে ভরতি হইয়াছে, বয়সও তাহার তখন অল্প। ওভার্‌সিয়ারকে সে ঠকাইয়াছিল। সেদিন পথে যে ওভার্‌সিয়ার লুকাইয়া থাকিবে, এ সংবাদ হরিপুরের পিয়ন তাহাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিল, দীনু, আজ সাবধান, পথে আজ থাকবে। কে থাকিবে, সে কথা দীনু পিয়নের ভ্রূনৃত্য দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। পথে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই সেদিন আসিতেছিল। সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুন্দীপুরের বুড়া-বটতলার অল্প দূরে আসিয়া দীনুর মনে হইল, গাছের একটা

ডাল যেন অল্প অল্প দুলিতেছে। তরুণ দীনুর তরল চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িল। গাছটাকে পাশে খানিকটা দূরে ফেলিয়া স্থানটা সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বল্লমের ঘণ্টাটা সে হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঘণ্টারও কোনও শব্দ হইল না। তারপর ওপাশে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া স্টেশনে ছুটিল। সেদিন খুব একচোট হাসিয়া সে আপন মনেই বলিয়াছিল, থাক বাবাধন, পথের পানে তাকিয়ে গাছের ওপর ব'সে।

ওভার্‌সিয়ার এদিকে গাছের উপর বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল, নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, তবু মেল-রানার আসিল না দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে নিজেই ছুটিতে ছুটিতে হরিপুর পোস্ট-আপিসে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আসিয়া তাহার চিন্তার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কোথায় গেল মেল-রানার! সে আবার আমদপুর স্টেশনে রওনা হইল। দীনু তখন সেখানকার ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই হরিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। ওভার্‌সিয়ার রিপোর্ট করিয়া বসিল। মিথ্যা বলিলে দীনুর জরিমানা হইত না, বরং ওভার্‌সিয়ারেরই লাঞ্ছনা হইত; কিন্তু দীনু মিথ্যা

বলিতে পারে নাই। পিয়ন তাহাকে বার বার বলিয়া দিয়াছিল, তুই বলবি, আমি ঠিক গিয়েছি হুজুর, ইষ্টিশানের টাইম দেখুন, আবার ঠিক সময়ে ফিরেছি, এখানকার টাইম দেখুন। ওভার্‌সিয়ারবাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

দীনু চিন্তিত মুখে উত্তর দিয়াছিল, তা, আজ্ঞে, কি ক'রে বলব আমি?

সুন্দীপুরের বটতলার নিকট আসিয়া দীনুর প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে। সে অল্প একটু হাসে। আরও কতবার এইখানে ওভার্‌সিয়ারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে এখনও কোন কোন দিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ডাক-হরকরা?

দীনু উত্তরে প্রশ্ন করে, টায়েন ঠিক আছে বাবু?

জঙ্গলের ভিতর হইতেই উত্তর আসে অথবা হাসিতে হাসিতে ওভার্‌সিয়ার রাস্তার উপর আসিয়া বলে, ঠিক আছে রে। তোর কিন্তু এক দিনও দেরি হ'ল না দীনু।

ডাক-হরকরা কিন্তু দাঁড়ায় না, ওভার্‌সিয়ারের এ ছলটুকুও সে জানে। সে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াই যায়, তাহার বর্শার ফলায় বাঁধা ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেই থাকে।

ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

আজও দীনু নিয়মিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ওভার-সিয়ারের কথা মনে পড়ায় নিতাইয়ের চিন্তা ভুলিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি, আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। তারকাদীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মানুষ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীনু প্রশ্ন করিল, উপরস্থারবাবু ?

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল।

ডাকাত। ডাক লুঠিতে আসিয়াছে।

মুহূর্তে দীনু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিল, বলিল, খবরদার, সরকারের ডাক।

এই দেখ, বস্তাটা দাও বলছি।

দীনুর হাতের বল্লমটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ; সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কে—নেতাই ?

নিতাই ধাঁ করিয়া দীনুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। পরমুহূর্তে সে শিকারী পশুর মত মেল-ব্যাগের উপর

লাফাইয়া পড়িল। দীনু পড়িয়া গেল, মাথার মাথালিটা গড়াইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও দীনু সবলে মেল-ব্যাগ নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সব্বনাশ হবে নেতাই—কালাপানি—ফাঁসি হয়ে যাবে।

নিতাই ক্ষুধার্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল, টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল, তখন বললে না কেনে—ব'লে রেখে দিলাম এমন ক'রে? দাও বলছি, রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালাব, চল।

দীনু এবার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, ডাকাত—ডাকাত।

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া নিতাই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল আলো দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্রমশ আলোর প্রভায় স্থানটা প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এবার শেষ চেষ্টা করিল, হাতের লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে দীনুর মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়া কালো একটা তরল ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীনুর মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। দীনু কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, বাবা গো!

আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর একবার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল; কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আলোটা একটা বাইসিক্লের আলো। আরোহী পথিক রক্তাক্ত-দীনুকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই, পথে পথিকের পথ-চলার বিরাম নাই, কিছুক্ষণ পরেই দূরে মানুষের সাড়া আসিল। কে যেন সাড়া দিল।

দীনুর জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘরে একখানা লোহার খাটের উপর সে শুইয়া আছে, মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা, কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া মাথাটা তাহার বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও সারি সারি লোহার খাটে আরও কত লোক শুইয়া আছে। দীনু বুঝিল, এটা হাসপাতাল। সে পূর্বে কয়বার শহরে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীনুর সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরই পোস্ট-আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া

প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন, এই যে, জ্ঞান হয়েছে তোমার।

দীনু সাহেবকে চিনিত, কিন্তু এখন সে তাঁহার মুখপানে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন, খুব বাহাদুর তুমি। সরকার তোমার ওপর খুশি হয়েছেন। তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সরকারের ডাক বাঁচিয়েছ, এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড, মানে—পুরস্কার পাবে।

দীনু তবুও নির্বাক।

সাহেব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কতজন ছিল তারা? কাউকে তুমি চিনতে পেরেছ?

দীনু এবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব নিজে পাখাটা লইয়া বাতাস দিয়া বলিলেন, ভয় কি, কাঁদছ কেন? কোন ভয় নেই, শিগগির ভাল হয়ে যাবে তুমি। ডাক্তার বলেছেন, কোন ভয় নেই তোমার।

তিনি নিজে রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, সুস্থ হয়ে ওঠ তুমি; আমি আবার আসব, রোজ এসে তোমায় দেখে যাব। ও-বেলায় ফল পাঠিয়ে দেব আমি।

দীনু অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল, হুজুর!

কিছু বলবে আমায়? কি বলবে, বল?

দীনু অতি কষ্টে বলিল, হুজুর, আমার ছেলে—

তোমার ছেলে—তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও ?

দীনু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল, হ্যাঁ হুজুর।

আচ্ছা।

সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিস। পুলিসের বড়সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু ডাকসাহেবের মত এত সহজে দীনুকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি বার বার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কাউকেই তুমি চিনতে পার নি ?

দীনু উত্তর দিল, অন্ধকার হুজুর।

কতজন ছিল তারা ?

ভাবিয়া চিন্তিয়া দীনু আবার বলিল, অন্ধকার হুজুর।

আচ্ছা, কি রকম দেখতে বল তো ? খুব জোয়ান ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক, কি ছোটলোক ?

দীনু চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, কি বলিবে, কাহার নাম সে করিবে ? মিথ্যা করিয়া অন্য কাহারও নাম—

দীনু শিহরিয়া উঠিল।

সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, দেখ, তুমি তাদের জান, চিনতে পেরেছ; বল তুমি, সে কে?

দীনু বিবর্ণ মুখে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব এবার রক্তচক্ষু হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, বল।

দীনু বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, হুজুর, আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন না, তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, সে তোমার ছেলে?

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দীনু বলিল, হ্যাঁ হুজুর।

আর? আর কে?

আর কেউ না।

পুলিস কিন্তু নিতাইকে পাইল না। সেই রাত্রি হইতেই নিতাই নিরুদ্দেশ। তাহার উদ্দেশ করিতে পুলিস উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—এগারো বৎসর। দীনু আজও ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নায়, বাদলে, বর্ষায়, দুরন্ত শীতের রাত্রে এখনও সে

তেমনই কোমরে পেটি বাঁধিয়া বল্লম আলো হাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তেমনই তাহার ঘড়ির কাঁটার মত গতি।

নিতাই কিন্তু সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আজও তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই। সরকারের মুলুকে সর্বত্র থানায় থানায় নাকি তাহার আকৃতি বিবরণ দিয়া হুলিয়া বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় নিতাই ?

দীনুর স্ত্রী সময় সময় ঘরের মধ্যে অতি মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে ; দীনু বাড়িতে থাকিলে নির্বাক হইয়া বাহিরে দাওয়ার উপর দুই হাতে মাথা ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। সান্ত্বনাও দিতে পারে না, বিরক্তি-প্রকাশও করে না। পাড়াপড়শীরা দীনুর নাম দিয়াছে—যুধিষ্ঠির। তাহাদের অশিক্ষিত জড়তাযুক্ত জিহ্বায় তাহারা বলে—যুজিষ্ঠির।

লজ্জায় দীনুর মাথাটা নুইয়া আসে। মাথা হেঁট করিয়া পাড়ার পথে সে যাওয়া-আসা করে। পোস্ট-আপিসেও তাহার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে কেহ নূতন ডাকবাবু কি ডাকসাহেব আসেন, তিনিই জিজ্ঞাসা করেন, দীনু কে ?

দীনু মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়ায়। সেদিন সে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠে, অকারণে পিয়নদের

সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। সেদিন তাহাদের বাসন মাজিয়া দেয় না, ডাকবাবুর গরুর ঘাস আসে অত্যন্ত কম।

পিয়ন বলে, এত গরম ভাল নয় রে, বুঝলি ?

সেদিন কাতিক মাসের একটি স্বল্প শীতকাতর রাত্রি। কাতিক মাসেই শীত এবার ঘন হইয়া আসিয়াছে। দীনু ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই আমদপুর পোস্ট-আপিসে হাজির হইল। এই আমদপুরেই রেলওয়ে স্টেশন, এখানকার পোস্ট-আপিস হইতে আবার ডাক লইয়া দীনু হরিপুর ফিরিবে। ডাক ফেলিয়া দিয়া সে তাহার নির্দিষ্ট চটখানা বিছাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। আপ ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গেলে ডাক লইয়া তাহাকে আবার রওনা হইতে হইবে। পাশে আরও কয়েকজন মেল-রানার শুইয়া আছে। তাহারা গল্প করিতেছিল ওভার্-সিয়ারকে লইয়া। জরিমানার প্রত্যক্ষ কারণ এই লোকটি কখনই ভাল লোক নয়, এই তাহাদের প্রতিপাদ্য ছিল। ওপাশে দুই জন বোধ হয় ঘরের সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছিল। ওদিকে স্টেশনে আপ মেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

দীনু বিরক্তভাবে বলিল, একটুকুন ঘুমো বাপু সব। পশ্চিমের ডাকগাড়ির ঘণ্টা হয়ে গেল। কলকাতার গাড়ি এলেই তো আবার সেই তল্পি কাঁধে তোল্।

একজন ব্যঙ্গ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, চুপ চুপ, ধম্মপুত্তুর যুজিষ্টির রেগেছে।

চাপা হাসির গুঞ্জনের শব্দে দীনু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মনে পড়িয়া গেল নিতাইকে। নিতাই মরিয়া গেলে দীনু এতদিন হয়তো তাহাকে ভুলিত। জীবন্ত মানুষ হারাইয়া যাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল; এ যে প্রতি প্রভাতে মনে হয়, আজ সে আসিবে; দিন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কাল সে আসিবে।

সকলের চেয়ে বড় আক্ষেপ দীনুর—নিতাইয়ের সন্ধান সে করিতে পাইল না। সেদিন একজন যাত্রী এই স্টেশনেই একটা আনি হারাইয়া সমস্ত রাত্রি পথের ধুলা ঘাঁটিয়া খুঁজিয়াছে। আর একটা মানুষ—

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম ভাঙিল তাহার পিয়নদের ডাকে। ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন পোস্ট-আপিসের জন্য ডাক বাঁধা হইতেছিল। হরকরারা আপন আপন পেটি বল্লম লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। প্রস্তুত হইয়া দীনু তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে ছোকরারা একটা আগুন জ্বালাইয়া হাত-পা গরম করিতে বসিয়াছে।

ঘরের ভিতর হইতে পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, ও দীনু, আফ্রিকাতে তোর কে আছে রে, অ্যাঁ—ইন্‌সিওর ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে ?

দীনু আশ্চর্য হইয়া গেল, বলিল, সি আজ্ঞে, কোথা বটেন ?

ওঃ, সে জাহাজে ক'রে যেতে হয় রে, সমদ্দুর পেরিয়ে। কাফ্রীর মুলুক সে, মানুষে সেখানে মানুষ খায়, প্রকাণ্ড বড় বড় বন, সিংহি গণ্ডার বাঘ ভাল্লুকে ভরতি সে সব।

দীনু আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সে দেশের নামই আমি.শুনি নাই কখুনও।

দাঁড়া দাঁড়া, কে পাঠাচ্ছে দেখি! এ যে দেখছি, সাউথ আফ্রিকান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি—জাহাজ কোম্পানি! ওঃ, এ যে অনেক টাকা রে—সাড়ে পাঁচশো টাকা!

দীনু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিল, আজ্ঞে, দেখি বাবু একবার।

পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, দেখে আর কি করিবি রাবা, একেবারে হরিপুর পোস্ট-আপিসেই গিয়ে নিবি।

ডাক বাঁধিয়া দীনুর কাঁধে তুলিয়া দিয়া দীনুকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। আকাশে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। চাঁদ পাণ্ডুর, 'সাত ভাই' তারাগুলিও ডুবিল বলিয়া। শেষরাত্রির বাতাসে যেন হিম ঝরিতেছে।

দীনু জনহীন পথে চলিয়াছে, ঝুনঝুন—ঝুনঝুন। চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—কোন্ দেশ-দেশান্তর হইতে জাহাজ কোম্পানি তাহাকে টাকা পাঠাইল, কিসের জন্য ?

অল্প টাকা নয়, সাড়ে পাঁচশো টাকা—উঃ, সে কত টাকা! ব্যাগটা যেন দীনুর ভারী মনে হইতেছিল। সহসা দীনুর খেয়াল হইল—এ কি, সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে! সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে পথের কোন্খানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল্ না; কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানি ? কিসের জন্য তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে ? সে যেন দেখিতেছিল—বিশাল অন্ধকার অরণ্য বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানি কই ? দীনু তাহার পিছনটা দেখিতেছে, সে যেন পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে।

সহসা তাহার মনে হইল, ওই কোম্পানি তাহার নিতাই নয়তো ? নিতাই হয়তো দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। পাকা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া চাকর—। কল্পনার গভীর অরণ্যে মুহূর্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুনকাম-করা পাকা বাড়ির মত বাড়ি।

দীনুর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম-শীতল রাত্রির শীতজর্জর সেই শেষ প্রহরেও সে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কাঁধের কাগজের বস্তা যেন সোনায়-বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে। একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাহার পাশে দাঁড়াইল। চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে। বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার পরিমাণ হয় না, হৃৎপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছটফট করিতেছে। দীনুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্তে—এইখানেই ব্যাগটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়।

পর-মুহূর্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, প্রাণপণে ছুটিল।

এ কি, পাখিরা কলকল করিয়া ডাকিয়া উঠিল যে! ভোর কি হইয়া গেল নাকি? কই, আকাশে 'ভুক্কো' তারা কই? কিন্তু দীনুর যে এখনও অনেক পথ বাকি! এই তো ষোলো মাইলের পাথর সে পার হইল! এখনও যে তিন মাইল পথ তাহাকে যাইতে হইবে!

দীনু যখন হরিপুর পোস্ট-আপিসে পৌঁছিল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা, প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে। পোস্ট-মাস্টার,

পিয়ন, সংবাদ-প্রার্থীর দল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীনু ক্লান্তভাবে ব্যাগটা ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এত দেরি কেন হ'ল রে? এ কি, তোর কি অসুখ করেছে দীনু?

দীনু হাঁপাতে হাঁপাতে বলিল, ডাকটা কেটে ফেলেন বাবু।

আচ্ছা আচ্ছা, ব'স্ শিগগির তোর ছুটি ক'রে দিচ্ছি।

ডাক কাটিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এ কি রে, তোর নামে যে একটা ইন্‌সিওর দীনু! টাকাও তো কম নয়, সাড়ে পাঁচশো! ওঃ, এ যে আফ্রিকা থেকে আসছে দেখছি!

দীনু কথা কহিতে পারিল না, শুধু হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, হাতটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পোস্ট-মাস্টার হাসিয়া বলিলেন, দাঁড়া একটু, জমা ক'রে নিই।

পিয়ন বলিল, আমাদের কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে, মিষ্টি খাব।

দীনু নির্বাক। জমা করিয়া লইয়া পোস্ট-মাস্টার বলিল, এইখানে একটা টিপ-ছাপ দে তো দীনু, হ্যাঁ—নে, এই নে।

খামখানা হাতে লইয়া দীনু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, জাহাজের ছবি আঁকা সুন্দর খাম, ছাপার হরফে নাম লেখা।

মাস্টার বলিলেন, দে, দেখি খুলে।

সন্তর্পণে ছুরি দিয়া খামখানা কাটিয়া সর্বাগ্রে তিনি নোট কয়খানা দেখিয়া বলিলেন, নে, ঠিক আছে সব। এ নোট আবার তোকে ভাঙাতে হবে। এই যে, চিঠিও রয়েছে।

চিঠিখানা তিনি মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে পিয়ন ডাক বিলি করিতেছিল—

পরম কল্যাণীয়া জগত্তারিণী দাসী, কুড়িগ্রাম।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—এই যে বাঁড়ুজ্জে মশায়, চিঠি।

এটা আবার হিন্দী। কি? ডাংখানা হরিপুর। সু— সুখন চৌবে।

দীনু বলিল, বাবু!

বাবু ভাবিতেছিলেন, কি বলিবেন! নিতাইয়েরই সংবাদ, নিতাই সেখানে জাহাজে খালাসীর কাজ করিত, সে মারা গিয়াছে। কোম্পানি তাহার অন্তিম-নির্দেশমত তাহার সঞ্চিত অর্থ দীনুকে পাঠাইয়াছে।

দীনু আবার প্রশ্ন করিল, বাবু?

কি লিখেছে ভাল বুঝতে পারছি না রে। আচ্ছা, নিতাই কে? নিতাই তো তোর সেই ছেলে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন আছে সে? কোথা আছে?

পোস্ট-মাস্টার নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দীনু বলিল, নেতাই নেই ?

পোস্ট-মাস্টার নীরব হইয়াই রহিলেন। দীনুও মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। কত কথা এলোমেলোভাবে তাহার শোকাতুর মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—সবই নিতাইয়ের কথা।

পোস্ট-মাস্টার অপরাধীর মত বলিলেন, আনন্দ ক'রে চিঠিটা খুললাম দীনু, কিন্তু শেষ আমিই তোকে এই খবরটা দিলাম !

দীনু চমকাইয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িল, সে নিজেই তো চিঠিখানা আনিয়াছে।

থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে ! কত—কত—কত সংখ্যা হয় না। মনে হইল, আজও পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।

চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

শেষ কথা

লাট ভরতপুর, পরগণে পূর্বচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। সবাই বলে, সোনার সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মত, ডাল ঢেঁকির মত; ঘষা হরিচন্দরের মত মোলাম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়, ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা—দেখতে দেখতে ফসলে ভ'রে যায় মাঠ; তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কি? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ ক'রে খায়, মার খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর? তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, হাতে লাগে নাই তো মারতে গিয়ে? পরনে ঠেঁটি কাপড়, কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠি, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ ক'রে খায়—চাষীর দল সব। জমিদার-পক্ষ বলে, চাষা। আগে খেত-দেত, চাষ করত, তামাক টানত, পূজা-অর্চনা করত, ঘুমুত। এখন আর সে কাল নাই, কলি বোধ হয় চার পো পুরা হয়ে উঠেছে, তারই ফলে আজকা'ল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোন

রকমে চাষ করে, ভগবানকে কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে, কেউ ব'সে ব'সে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল মঙ্গলকোটের মিয়াদের জমিদারি। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যাবসা করতে এসেছিলেন। মিয়াদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, এক পক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। ধার সহস্র ধারায় যখন বাড়ে, তখন কি আর রক্ষা থাকে! তার উপর এই যে চাষী প্রজাদের মাতব্বর, তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল—এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজের গালে—। ও কথাও যাক, পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। একেবারে হালের কথাই ভাল। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে গাঁয়ে কাছারি, কাছারিতে কাছারিতে নায়েব, বড় কাছারিতে বড় নায়েব, এ ছাড়া পদ্মাপার নিজের দেশ থেকে আমদানি করা পাইকের দল এনে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন সাউ মহাশয়েরা। এ ছাড়াও সাউ মশায়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকানদানি খুলে ফলাও ব্যাবসা ফেঁদে বসেছেন।

অনেক কলকারখানাও বসিয়েছেন, এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এই সব লোকেরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়, কেউ বা কাঁদে। তা কাঁদুক আর দাঁত খিঁচোক— দিন চলছিল ভালয় মন্দতে। জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানি নিয়ে ঝগড়া ক'রে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি, জানিয়ে, পাইকদের খোরাকি রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না না' ক'রে, সাউ দোকানদারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাকচাতুরি ক'রে, কলকারখানার মজুরি নিয়ে বিসংবাদ ক'রে, নানা টক-ঝকের মধ্যে দিয়ে দিন চলছিল এক রকম ক'রে। ঘানির চারপাশে চোখ-ঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মত সবই চলছিল। তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিল কলু, আর খোলও হচ্ছিল—তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠার মত সব ন'ড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। সাউ জমিদার মহাশয়দের সঙ্গে হলদীবাড়ির সাই জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারি বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারি, বলা নাই, কওয়া নাই, নোটিশ নাই, পত্র নাই, সাঁইবাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন-বাদাড় ভেঙে লাটি সোঁটা সড়কি বল্লম নিয়ে ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হ'ল। কাছারিতে ঢুকে মারধর খুনজখম ক'রে দখল

ক'রে নিলে সব। সাউবাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারিতে ঢুকল। শুধু তাই নয়, সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘ'টে গেল। লাঠিসোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়-জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুরে ঢুকেও যে তারা শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে, এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারিতে কাছারিতে সাজ্ সাজ্ রব উঠল।

চাষীদের দল সব চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়া লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো ক'রে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব প'ড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়া ভাবনায় মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়াকে ঘিরে বসল। সসম্মানে হাত জোড় ক'রে বুড়া ফোকলা দাঁতে, মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপ-খুড়া-ভাই-বোনদের দেখে, সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে ব'সে গেল তারপর বললে শুধু একটি কথা, কর্তা! ওই একটি কথাতেই সব ওদের বলা হয়ে গেল। কর্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়ার সুখেও হাসি, দুখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়া ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গৌরপুরের একজনা বললে, সাউবাবুরা আমাদের জমির মালিকানি মানছে নাই। আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে? সাউয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার—তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানি মানে, তবে উয়াদের হয়েই সাক্ষী দাও না কত্তা।

বুড়া ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ-হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে-পুটে লাগাই ফৌজদারি, এস।

বুড়া ঘাড় নাড়লে, উঁ-হু।

কেনে, ভয় লাগছে নাকি?—ছোকরা রুখে উঠল।

বুড়া হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়া হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না, তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো!

রতনলাল বললে, যা হয়, চটপট ঠিক ক'রে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়া হাসলে; রতনের উপর তার অনেক ভরসা। ভারি ভাল ছোকরা। আর তেমনই কি সাহস!

ঠুকঠুক ক'রে বুড়া কাছারিতে এসে উঠল, রাম রাম গো লায়েব মশয়!

কে, লালমোহন? এস এস।

হ্যাঁ, এলম একবার।

এলম-টেলম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার। সাঁই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট ক'রে দিতে হবে, একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়া হাসলে। কি যে বলেন লায়েব মশয়?

কেন?

ওই! কেটে ফেলালে রক্ত পড়বে যে গো! ম'রে যাবে যে লোকগুলান! পাপ হবে যে! বুড়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেল বুড়ার এই ভণ্ডামি দেখে। তবুও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ ক'রেও ভদ্রভাবে বললে, হুঁ, বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমাদের চোখে জল আসছে। বুঝতে পারছি সব।—ব'লে খসখস ক'রে কয়েক ছত্র লিখে আবার বললে, আর আমাদের পাইকদের যে খুন-জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তার বেলায়—

বুড়ার ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল, হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি লায়েববাবু, আঃ—হায় হায় হায়! কত লাগল তাদের ভাবেন, দেখি? সে চোটগুলান, মনে হয়, আমারই বুকে পড়ল গো।

নায়েব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড পাষণ্ড, না, সত্যই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই নায়েবের ইস্পাতের ভ্রমরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়ার ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হ'লে? তা হ'লে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়ার হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি, আমাদের জমির মালিকানিটি মেনে লাও তুমরা, সব পাইক বরকন্দাজ নিয়ে তফাত হয়ে থাক, দেখ, সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফোজদারির কি বোঝ তোমরা? চাষ কর, খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কি চালাতে জান?

বুড়া হাসলে।

হাসছ যে?

আপনকার কথা শুনে হাসছি গো। আমরা লাঠি সড়কি ধরবই নাই যে।

তা হ'লে কি ক'রে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমরা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কি। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টনটন করবে, চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা-হা ক'রে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি?

বুড়া কিন্তু আশ্চর্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো, হয়। আমার মন শুধালে যে ভগবানকে। ভগবান যে বুললে গো। আপনকাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো। না হ'লি বুঝতি পারতে আমার কথা।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী ; বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্ষ্যাপার ক্ষেপীর মত।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়ার মতই সাউ নায়েবের জন্য চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে ? হ্যাঁ গো বুড়া ?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে ? কি করবে তুমি ?

আমি ? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হাঁ, হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি ? আমি মরব।

মরবে ?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখুন উয়ারা মনে

দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখুন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুশি হয়ে উঠল। হেসে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক বুলেছ তুমি।

বুলি নাই ? হেসে বুড়া বুড়ীর দিকে তাকালে।

হঁা। তাই কর তুমি। মর। ম'রে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কত্তা !

বেটা ! আয় রে বেটা, আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বললে, সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কত্তা। কি হ'ল, কি করব, তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

বুড়া বাইরে এসে জোড়হাত ক'রে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডগোল ঘ'টে গেল। সাউবাবুদের পাইক বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর-নায়েব চারু শীল, জাঁদরেল নায়েব। সে কারও তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে। পাগলাটাকে

পাকড়ে আটকে রাখ। শুধু পাগলা নয়, রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমী আটক করো—বিলকুল।

বুড়া হেসে বললে, চল। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চল্ বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললে, আমি?

সাউবাবুদের লোক বললে, হাঁ হাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেরাসে সবুর করো বেটা; বুড়ার কৌপীন, আমার কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নিই। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হ'লেও মেয়েলোক কিনা! লোটার মায়া ছাড়তে পারে না।

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন ক'রেই রাখলে। সে দিক দিয়ে তারা এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়া কিন্তু সেই বুড়া, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে, ভগবানকে ডাকে আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান, আমার মনকে বুলে দাও, কি করব? মরব? আমি মরলে উয়ারা দুখ পাবে? তুমি উয়াদিকে জ্ঞান দিবে?

বুড়ী আটকের মধ্যেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি

করে, বিছানা, মানে—কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে ক'রে রাখে। তার যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজার কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না দুটা কথা বলবার—ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখান, কাল সেখান, এ আসছে, সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে রেখে দেয়। এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেয়েছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই, বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথায় ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলত, বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয়, কথাটি মিথ্যা নয়।

সে বলে, বুড়া!

উঁ? বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয়, বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—ওই কোন্ দিকদিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

কি ভাবছ?

ভাবছি? বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভাল লাগছে নাই আমার।
হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ ব'লে বুড়া চুপ ক'রে যায়।
ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান, বুড়াকে বাঁচিয়ে রাখ। না হ'লে এত ভাবনা ভাববে কে?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।
বুড়ীর বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হ'লে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে ম'রে যাবে সে শুধু বললে, কেনে বুড়া? মরবে কেনে?
মরব। সাউবাবুরা বুলছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বুলে এসেছিলাম, ফৌজদারী দাঙ্গা করতে। বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিঠ হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলি উদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বুলছে, ই সব আমার শিক্ষা।
রতনলাল বললে, তার লেগে তো কত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকদেরও খুব মার দিয়েছে।
বুড়া ঘাড় নেড়ে হাঁসলে। বললে, শুধু তাই লয় রতন।

আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকেদের পাপ হ'ল। আমি মরি, ম'রে ভগবানকে বুলব, ভগবান, তুমি পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কত্তা ?

বুড়া হাসলে। তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণ-পণ ক'রে বসে। খায় না, দায় না, চুপ ক'রে, প'ড়ে থাকে।

বুড়ীর কথাবার্তা সব ফুরিয়ে গিয়েছে যেন, সে চুপ ক'রে ব'সে চেয়ে থাকে। হায়, বুড়া তার হারিয়ে গেল! তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই! কান্না লজ্জা, বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নাই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ উঠে, ভগবান, আমাদের কর্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে, বলে, বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এতগুলি লোকের মুখের দিকে চাও। আমার

মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয়, বুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয়, ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউ-বাবুরা বড় বদ্যিও পাঠিয়েছিলেন, তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না খেলে মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তবু বুড়া বাঁচে। আশ্চর্য বুড়া, সব সময়ের মধ্যে একটিবারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মত হাসি মিলিয়ে যায় নাই। ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল, মুখের রঙে ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মত ঝকমকে রেশ। বুড়া বললে, আমি বাঁচলাম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া, আমি এইবার মরব।

কেনে ?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আর—

আর কি ?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যই মারা গেল। জ্বর হ'ল সামান্য। সেই জ্বরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হ'ল, লোকের কথা মিথ্যে, মিথ্যে ; সত্যি নয়, সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হাঁ হাঁ, বুড়ার চোখে জল।

সে বললে, বুড়া !

চোখের জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী, কি বুলছ, বল ?

মরণ ভারি স্নুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি স্নুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল, ঝ'রে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না, থাক্।